॥ শ্রীহরিঃ ॥

956▲

# সাধন এবং সাধ্য

साधन और साध्य (बँगला)

गीताप्रेस गोरखपुर

GITA PRESS, GORAKHPUR

স্বামী রামসুখদাস

।। শ্রীহরিঃ ।।

# সাধন এবং সাধ্য

## (করণসাপেক্ষ-করণনিরপেক্ষ সাধনা এবং করণরহিত সাধ্য)

साधन और साध्य (बँगला)

স্বামী রামসুখদাস

*Books are also available at—*

1. **Gobind Bhavan**
   151, Mahatma Gandhi Road,
   Kolkata—700 007
   Phone: (033) 40605293, 22680251,
   22686894
2. **Howrah Station**
   (a) (P.F. No. 5) Near Tower Clock
   (b) (P.F. No. 18) New Complex
3. **Sealdah Station** (P.F. No. 8)
   (Near Main Enquiry)
4. **Kolkata Station**
   (P.F. No. 1, Near Over Bridge)
5. **Asansol Station**
   (P.F. No. 5, Near Over Bridge)
6. **Kharagpur Station**
   (P.F. No. 1-2)

Eleventh Reprint 2018 3,000

Total 36,000

❖ **Price : ₹ 10**

**(Ten Rupees only)**

Printed & Published by :

**Gita Press, Gorakhpur—273005 (INDIA)**

(a unit of Gobind Bhavan-Karyalaya, Kolkata)

Phone : (0551) 2334721, 2331250, 2331251

web : **gitapress.org** e-mail : **booksales@gitapress.org**

**Visit gitapressbookshop.in for online purchase of Gitapress publications.**

956 Sadhan Aur Sadhya (Bangla)_Section_1_Back

# নম্র নিবেদন

পরমশ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রীরামসুখদাসজী মহারাজ প্রতিবর্ষে গ্রীষ্মকালে গীতাভবন, স্বর্গাশ্রম (ঋষিকেশ)-এ সৎসঙ্গের জন্য আগমন করেন। এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সাধকেরা কখনও কখনও তাঁদের সমস্যা, সংশয়, স্বামীজীর কাছে উপস্থাপিত করেন এবং স্বামীজী সেগুলির যথোচিত এবং সন্তোষজনক সমাধান করে তাঁদের পথ প্রদর্শন করেন। প্রায় দু বছর ধরে এখানে করণনিরপেক্ষ সাধনা-এর উপর অনেক আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর হয়েছে। তাই মহারাজ এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার কথা চিন্তা করেন, যাতে সাধকেরা এই মার্মিক বিষয়টি সহজে বুঝতে পারেন এবং তা থেকে তাঁরা লাভবান হন। এই বিষয়ে এটি একটি অসাধারণ পুস্তক। বিবেকপ্রধান সাধনা সম্পর্কে এমন আর কোনও পুস্তক রচিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। অতএব পাঠকদের এটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

এই পুস্তকে কয়েকটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে বোঝাবার দৃষ্টিতে এইরকমের পুনরাবৃত্তি দূষণীয় নয়। উপনিষদেও **'তত্ত্বমসি'** এই উপদেশকে নয়বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এইজন্য ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে—**'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'** (৪।১।১)।

পাঠকদের কাছে আমাদের প্রার্থনা তাঁরা যেন কেবল তত্ত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকটি অধ্যয়ন করেন। এরই সঙ্গে পরমশ্রদ্ধেয় স্বামীজী মহারাজের লিখিত **'সহজ সাধনা'**, **'নিত্যযোগের প্রাপ্তি'**, **'বাসুদেব সর্বম্'** প্রভৃতি পুস্তকগুলিও যেন অধ্যয়ন করেন এবং তা থেকে লাভবান হন।

—**প্রকাশক**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# অনুবাদকের কথা

মানুষের জীবনের পরম প্রাপ্তি হলো পরমাত্মার সঙ্গে তল্লীন হয়ে যাওয়া। পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে সহযোগ মানুষের জীবনের পরম প্রত্যাশা। এইটিই হলো জীবনের লক্ষ্য, ভাষান্তরে সাধ্য। সাধ্যের সঙ্গে সাধনের ওতঃপ্রোত সম্পর্ক। সাধ্য যখন পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি তখন সাধন কী হবে ? এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এইসব মতান্তরের মধ্যেও যে একটি কথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত সেটি হলো সাধন বা মার্গ ভিন্ন ভিন্ন যদিও, প্রাপ্তি কিন্তু সেই একই। অর্থাৎ সাধ্য সম্পর্কে কোনও বিসংবাদ নেই। স্বামী রামসুখদাস মহারাজ এই পরম্পরাগত চিন্তাকে অস্বীকার করেননি, আবার তারই মধ্যে নিজেকে সীমিত করে রাখেননি। তাঁর চিন্তা এবং বক্তব্যের বিশিষ্টতা হলো, অত্যন্ত দুরূহ বিষয়কেও সহজভাবে সকলের কাছে তুলে ধরা। **'সাধন এবং সাধ্য'** পুস্তকটিও তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

বর্তমান পুস্তকে স্বামীজী করণসাপেক্ষ এবং করণনিরপেক্ষ সাধনের কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে এই কথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে সাধনের সঙ্গে করণের সম্পর্ক থাকলেও সাধ্য বা পরমাত্মতত্ত্ব হলো করণরহিত। করণ কী ? যা দিয়ে কোনও কর্ম করা হয় তাই হলো করণ। চোখ দিয়ে দেখি, চোখ হল করণ। লাঠি দিয়ে মারি, লাঠি হলো করণ। এটি যেমন সত্য, তেমনই স্পর্শেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নেই, যদিও শ্রবণ যে করবে সেই দেহধারী মানুষের অস্তিত্বে স্পর্শেন্দ্রিয়েরও স্থান আছে। তাই এখানে শ্রবণের কাজকে স্পর্শরহিত না বলে স্পর্শ নিরপেক্ষই বলতে হবে। এইভাবেই সাধনা করণ-নিরপেক্ষ হতে পারে কিন্তু করণরহিত হতে পারে না।

কিন্তু সাধ্যের সঙ্গে করণের সম্পর্ক নেই। সাধ্য করণরহিত। দেখার ক্রিয়াটি করণসাপেক্ষ। অন্য ইন্দ্রিয়গুলি করণনিরপেক্ষ ; কিন্তু ক্রিয়াটি যখন সম্পন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ লক্ষ্যে যখন পৌঁছান হয় তখন সেই লক্ষ্য বা সাধ্যের সঙ্গে করণের কোনও সম্পর্ক থাকে না, সাধ্য তখন করণরহিত হয়ে যায়। স্বামীজীর কথা হলো পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি করণনিরপেক্ষ কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব স্বয়ং করণরহিত। এই বিষয়টিকেই বর্তমান পুস্তকে বিস্তৃতাকারে আলোচনা করা হয়েছে।[১]

বাংলাভাষী পাঠক এই তত্ত্বসমৃদ্ধ পুস্তকটি পড়ে অধ্যাত্ম সাধনার নতুন আলোকের সংকেত পাবেন এই বিশ্বাস নিয়েই অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছি। কতদূর সফল হয়েছি তা বিচারের ভার পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

**—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

[১]'সাধন এবং সাধ্য' এই দুরূহ বইটির পরিপূরকরূপে **'সহজ-সাধনা'** বইটিও দেখলে পাঠকেরা উপকৃত হবেন।

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# সূচীপত্র

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# সাধন এবং সাধ্য

যেসব সাধক পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে চান তাঁদের সাধনার দুটি শৈলী আছে—করণসাপেক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রধান শৈলী এবং করণ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ বিবেকপ্রধান শৈলী। যে শৈলীতে করণ (ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি) তথা ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে তাকে '**করণসাপেক্ষ সাধনা**' বলা হয় আর যে শৈলীতে সৎ-অসৎ-এর বিবেকের প্রাধান্য থাকে তাকে '**করণনিরপেক্ষ সাধনা**' বলা হয়।

## করণ কী ?

ক্রিয়ার সিদ্ধিতে যা প্রধান হেতু তাকে 'করণ' বলা হয়। যেমন, শ্রবণে কান হলো করণ, স্পর্শ করাতে ত্বক হলো করণ, দর্শনে চক্ষু, স্বাদে জিহ্বা, ঘ্রাণে নাসিকা, চিন্তন করায় চিত্ত, কোনও কথা বোঝার করণ হলো বুদ্ধি, কর্তা-ভোক্তা হওয়ায় করণ হলো অহং। তাৎপর্য হলো এই যে সাংসারিক কার্য করার যত কিছু হাতিয়ার, সেই সবগুলিকেই '**করণ**' বলা হয়।

শরীরে মোট তেরটি 'করণ' আছে। শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাণী, হস্ত, পদ, লিঙ্গ এবং পায়ু— এই দশটি হলো (জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়) বহিঃকরণ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার— এই তিনটি হলো 'অন্তঃকরণ'।[১]

~~○~~

---

[১] কোথাও মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার—এই চারটিকে অন্তঃকরণ বলা হয়েছে, কোথাও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই তিনটিকে অন্তঃকরণ বলা হয়েছে, আবার কোথাও মন (চিত্ত) এবং বুদ্ধি (অহঙ্কার)—এই দুটিকে অন্তঃকরণ বলা হয়েছে। এই সবগুলিতে 'অহঙ্কার' হলো মুখ্য।

## করণসাপেক্ষ এবং করণনিরপেক্ষ কী ?

যাতে করণের অত্যন্ত আবশ্যকতা থাকে সেটি হলো করণসাপেক্ষ এবং যাতে করণের আবশ্যকতা থাকে না সেটি হলো করণনিরপেক্ষ। যথা—ক্রিয়ার সিদ্ধির জন্য করণের অত্যন্ত আবশ্যকতা থাকে ; কেননা করণ ছাড়া ক্রিয়া হতে পারে না, অতএব ক্রিয়ার সিদ্ধি হলো করণসাপেক্ষ। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে করণের প্রয়োজন নেই। কেননা সেই তত্ত্ব ক্রিয়ার অতীত। অতএব পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হলো করণনিরপেক্ষ।

~~○~~

## করণনিরপেক্ষ এবং করণরহিতের মধ্যে পার্থক্য

সাধনা হলো করণনিরপেক্ষ এবং সাধ্য হলো করণরহিত। পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রাপ্তি হলো করণনিরপেক্ষ কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব হলো করণরহিত।

দুটি লোক কথাবার্তা বললে তাতে বলার জন্য জিভ এবং শোনার জন্য কানের দরকার। কিন্তু চামড়ার দরকার নেই। সেইজন্য তাদের কথাবার্তাকে ত্বকনিরপেক্ষ তো বলা যেতে পারে, কিন্তু ত্বকরহিত তো বলা যায় না। কেননা যদি মানুষ ত্বকরহিত হয় তাহলে সে কি করে কথাবার্তা বলতে পারে ? তেমনই সাধনা করণনিরপেক্ষ হয় বটে কিন্তু করণরহিত হয় না।

পড়াশোনা চক্ষুনিরপেক্ষ হয়, কিন্তু চক্ষুরহিত হয় না। চক্ষু নিরপেক্ষ বলার অর্থ হলো এই যে, যার চক্ষু আছে সে যেমন পড়াশোনা করতে পারে তেমনই যার চোখ নেই সেও (কানে শুনে) পড়াশোনা করতে পারে। পড়াশোনাকে যদি চক্ষুরহিত বলেন তাহলে যার চোখ নেই সে পড়াশোনা কি করে করতে পারবে ? এইভাবেই সাধনা করণনিরপেক্ষ হয়, করণরহিত হয় না।

শরীর থেকে 'নিরপেক্ষ' হলে মুক্তি হয়, 'সাপেক্ষ' হলে বন্ধন হয়। আর 'শরীরমুক্ত' (রহিত) হলে মৃত্যু হয়।

~~○~~

## ধনের দৃষ্টান্তের দ্বারা করণনিরপেক্ষতার বিবেচনা

অর্থ (মুদ্রা) হলো বস্তুপ্রাপ্তির সাধন, সাধ্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে অর্থ স্বয়ং বস্তুপ্রাপ্তির সাধন নয়, বরং অর্থের ব্যয়ই (ত্যাগ) বস্তুপ্রাপ্তির সাধন। কারণ অর্থের দ্বারা বস্তু প্রাপ্তি হয় না, অর্থ ব্যয় করলেই তা হয়ে থাকে। যদি অর্থের দ্বারা বস্তুর প্রাপ্তি হোত তাহলে আমাদের কাছে অর্থ থাকা অবস্থাতেই অর্থাৎ অর্থ ব্যয় না করেই অর্থের দ্বারা বস্তু প্রাপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু ব্যয় করলেই অর্থ আমাদের অথবা অন্যের কাজে আসে। অতএব অর্থকে গুরুত্ব না দিয়ে তা ব্যয় করাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ অর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তা ব্যয় করাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনুরূপভাবে করণ হলো সাধন, সাধ্য নয়। বাস্তবে করণকে ত্যাগ করাই (সম্বন্ধ বিচ্ছেদ) হলো তত্ত্বপ্রাপ্তির সাধন ; কেননা করণের দ্বারা তত্ত্বের প্রাপ্তি হয় না, বরং করণকে ত্যাগ করলেই তা হয়। অতএব করণকে গুরুত্ব না দিয়ে সেটির ত্যাগকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অর্থকে গুরুত্ব দিতে থাকব ততক্ষণ আমরা অর্থ ব্যয় করতে পারব না। তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা করণকে গুরুত্ব দিতে থাকব ততক্ষণ আমরা করণ থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করতে পারব না। সেইজন্য সাধককে শুরুতেই এই কথা বুঝে নিতে হবে যে, করণ গুরুত্বের বিষয় নয়। তাকে ত্যাগ করাই (সম্বন্ধ বিচ্ছেদ) হলো গুরুত্বের বিষয়। অতএব করণের দ্বারা কার্য সিদ্ধি করলেও তাকে যেন গুরুত্ব দেওয়া না হয়। তার প্রত্যাশা যেন না থাকে। তাহলেই করণনিরপেক্ষ সাধনা হবে।

যদি আমরা অর্থকে গুরুত্ব দেই তাহলে আমাদের সংগ্রহবুদ্ধি (অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি গুরুত্ব) হয়ে যাবে। সংগ্রহ বুদ্ধি হওয়া অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া হলো পতনের আসল কারণ। অর্থ সংগ্রহকে

গুরুত্ব দিয়েছেন এমন মানুষেরা বড় বড় পাপ, অন্যায়, অত্যাচার করে ফেলেন। অতএব অর্থ ত্যাগ (ব্যয়) হলো সাধন। কিন্তু বস্তুপ্রাপ্তিকে অর্থের অধীন মেনে নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা খুবই অ-সাধন। এইভাবে করণকে ত্যাগ করা (সম্বন্ধ বিচ্ছেদ) হলো সাধন, কিন্তু তত্ত্ব প্রাপ্তিকে করণের অধীন মেনে করণের সহায়তা নেওয়া খুবই অ-সাধন। তাৎপর্য হলো, অর্থকে তো কাজে লাগাতে হবে, কিন্তু গুরুত্ব অর্থকে না দিয়ে অর্থব্যয়কে দিতে হবে। তেমনই করণকে তো কাজে নিতে হবে কিন্তু গুরুত্ব করণকে না দিয়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকেই দিতে হবে। যদি আমরা করণকে গুরুত্ব দেই তাহলে করণ বন্ধনকারী হয়ে যাবে এবং আমরা করণের অতীত হতে পারব না। করণের অতীত না হলে করণরহিত তত্ত্বের প্রাপ্তি কি করে হবে ?

জীবন-নির্বাহের জন্য আমাদের অন্ন, জল, বস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন নেই। অর্থ পাই আর না পাই কিন্তু বস্তু পাওয়া চাই। আমাদের কাছে যদি কেবল অর্থ থাকে আর অন্ন, জল, বস্ত্র প্রভৃতি না থাকে তাহলে বেঁচে থাকতে পারব না। কিন্তু আমাদের কাছে যদি কেবল অন্ন, জল, বস্ত্র প্রভৃতি থাকে আর অর্থ না থাকে তাহলেও আমরা ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারব। এখানে এই সংশয় উত্থিত হতে পারে যে অর্থ কাছে না থাকলে বস্তু পাওয়া যাবে কি করে ? এর উত্তর হলো যে অর্থ কাছে না থাকলে ভাগ্যক্রমে (প্রারব্ধবশত) অথবা ভগবানের বিধানে বস্তু পাওয়া যেতে পারে।[১] যেমন, কোথাও পরিশ্রম (চাকরী) করলে তার বদলে বস্তু পাওয়া যায় কিংবা কেউ কোনও উপহার অথবা পুরস্কার দিলে বস্তু পাওয়া যায়, বস্তুর বদলে বস্তু পাওয়া যায় ; যাঁদের

---

[১]প্রারব্ধ পহলে রচা, পীছে রচা শরীর।
তুলসী চিন্তা ক্যোঁ করে, ভজলে শ্রীরঘুবীর॥

কাছে অর্থ (মুদ্রা) নেই সেই সাধু-সন্তরাও জীবন-নির্বাহের জন্য বস্তু পেয়ে যান। তাৎপর্য হলো, জীবন-নির্বাহের জন্য অর্থের প্রত্যাশা থাকে না। বস্তু অর্থের দ্বারাই পাওয়া যায়—এটি হলো অর্থের জন্য প্রত্যাশা। বস্তু অর্থের দ্বারাও পাওয়া যায় আবার অর্থ ছাড়াও পাওয়া যায়— এটি হলো ধনের (অর্থের) নিরপেক্ষতা। তেমনই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে করণের জন্য প্রত্যাশা থাকে না অর্থাৎ তা করণনিরপেক্ষ।[১]

~~○~~

[১]এখানে করণনিরপেক্ষ সাধনাকে বোঝাবার জন্য অর্থের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে দৃষ্টান্ত কখনই পুরোপুরি ঘটে না, তা আংশিক রূপেই ঘটে। তা যদি পুরোপুরি ঘটে যায় তাহলে তা আর দৃষ্টান্ত থাকে না, দার্ষ্টান্ত হয়ে যায়। তাই দৃষ্টান্ত হলো তত্ত্বকে বোঝার সংকেতমাত্র।

## করণের প্রয়োজনীয়তা কতটা ?

জুতার প্রয়োজন তখনই থাকে যখন রাস্তা কাঁকর ও কাঁটায় ভরা থাকে। তেমনই সাধনায় করণের প্রয়োজন ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ বিবেকে ন্যূনতা থাকে, অর্থাৎ বিবেক সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত না হয়। বিবেক জাগ্রত না হওয়ার কারণ হলো নিজের বিবেকের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া। ভোগ এবং সংগ্রহের প্রতি আসক্তির জন্যই মানুষ তার নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেয় না।[১]

যেখানে আবর্জনা আছে, ঝাঁটা সেখানেই ব্যবহৃত হয়। তেমনই যেখানে সংসারের প্রতি গুরুত্ববোধ থাকে সেখানেই বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধির প্রয়োজন থাকে। যেমন ঝাঁটা এবং আবর্জনা একই জাতির, তেমনই করণ এবং সংসার— এই দুটিও একই জাতির অন্তর্গত। আবর্জনা সরিয়ে ফেললে যেমন ঝাঁটাকেও সরিয়ে ফেলা হয় তেমনই সংসারের প্রতি গুরুত্ববোধ ত্যাগ করলে করণের ত্যাগ হয়ে যায়।

করণনিরপেক্ষ সাধনায় করণকে ত্যাগ করবার জন্যই করণকে কাজে লাগান হয়, সঙ্গে রাখার জন্য নয়। যদি করণের প্রতি গুরুত্ববোধ থাকে, তাহলে সেটিকে ত্যাগ করা যাবে না। করণের প্রতি গুরুত্ববোধ থাকার অর্থ হলো করণের দ্বারাই তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়—এটি মেনে নেওয়া।

করণ হলো সাধন, সাধ্য নয়। সাধ্য তো করণরহিত পরমাত্মতত্ত্ব। অতএব করণের সদ্ব্যবহার তো করতে হবে, কিন্তু তার প্রত্যাশা থাকা ঠিক নয়। প্রত্যাশা থাকলে করণের অধীনতা মেনে নিতে হবে। জড়ের

---

[১]ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। (গীতা ২।৪৪)

'ভোগ এবং ঐশ্বর্য (সংগ্রহ)-এর বর্ণনাকারী বাণীর দ্বারা যাদের অন্তঃকরণ ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং যারা ভোগ এবং ঐশ্বর্যে খুব বেশি আসক্ত, সেইসব মানুষের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থাকে না।'

অধীনতা, দাসত্ব থাকলে চিন্ময় তত্ত্ব পাওয়া যাবে না। করণের প্রত্যাশা না থাকলে জড়ের দাসত্ব থাকবে না এবং সাধক স্বাধীনভাবে স্বাতন্ত্র্য (মোক্ষ) লাভ করবে।

করণনিরপেক্ষ হলেই সংসারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত করণের প্রতি প্রত্যাশা থাকবে ততক্ষণ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হবে না, কেননা করণও হলো সংসারের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সংসারেরই জাতীয়।

করণকে কাজে লাগান দোষের নয়, দোষ হলো করণের প্রতি গুরুত্ববোধ রাখা, তার আশ্রয় নেওয়া, তার অধীন হয়ে যাওয়া, তার প্রত্যাশা রাখা। তাই বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে, তার সদ্ব্যবহার করতে হবে কিন্তু তার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। সাধককে এই চিন্তা করতে হবে যে তিনি কি বুদ্ধি ? যদি তিনি নিজে বুদ্ধি না হন তাহলে তিনি কি বুদ্ধির, না বুদ্ধি তাঁর ? যদি বুদ্ধি তাঁর হয় তাহলে তাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি বুদ্ধি থেকে ভিন্ন, তাঁর বুদ্ধির কোনও প্রয়োজন নেই, বরং তাঁকে প্রয়োজন বুদ্ধির। অতএব বুদ্ধিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের স্বরূপে স্থিত হতে হবে। যতক্ষণ বুদ্ধি সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের অবিদ্যমানতা হবে না এবং অহং (পরিচ্ছিন্নতা বা ব্যক্তিত্ব) বজায় থাকবে।

যেমন চোখকে দেখতে ছোট হলেও এটি এত সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক যে ভূমণ্ডল, তারা, নক্ষত্র প্রভৃতি সবকিছু দেখার পরও জায়গা খালি থাকে। এমন হয় না যে আর খালি জায়গা নেই, আর দেখা যাবে না। যে জিনিষ চোখে দেখা যায় না তাকে মন, বুদ্ধির দ্বারা দেখা যায় অর্থাৎ তাকে জানা যায়। বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক যে সমস্ত বেদ-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র, অনেক বিদ্যা, অনেক ভাষা, লিপি, চার যুগ এবং চৌদ্দভুবনের জ্ঞান তথা ব্রহ্মার আয়ুও বুদ্ধি জানতে পারে। তবু এমন হয় না যে ; বুদ্ধিতে আর খালি জায়গা নেই, আর কিছু জানা যাবে না। বুদ্ধির মধ্যে এত

বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধি হলো দৃশ্য, দ্রষ্টা নয় ; কেননা বুদ্ধি হলো করণ (অন্তঃকরণ)। করণ হলো প্রকৃতির কার্য। করণের দ্বারা প্রকৃতিকে জানা তো দূরের কথা, প্রকৃতির কার্যও পুরোপুরি জানতে পারি না। তাহলে প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তাকে কি করে জানতে পারব ?

যদি আমরা ব্রহ্মকে বুদ্ধি দিয়ে জানার চেষ্টা করি তাহলে তো আমরা ব্রহ্মকে বুদ্ধির বিষয় করে তুলব। অর্থাৎ ব্রহ্ম তখন দৃশ্য (একদেশীয়) হয়ে যাবেন আর বুদ্ধি দ্রষ্টা (ব্যাপক) হয়ে যাবে। সেই বিষয়ই বুদ্ধিতে আসে যা বুদ্ধির চেয়ে ছোট। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ব্রহ্মকে বুদ্ধির জ্ঞানের দ্বারা দেখতে থাকব, বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে বিচার করব ততক্ষণ আমাদের স্থিতি জড়েই থেকে যাবে। তার কারণ বুদ্ধি সহ সাংসারিক বিষয় — সবকিছুই প্রকৃতির কার্য হওয়ায় সেগুলি দৃশ্যই (জড়) হয়ে থাকে। এইজন্য বলা হয়েছে—

**রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্‌দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্।**
**দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব তু ন দৃশ্যতে॥**

(বাক্যসুধা ১)

‘সর্বপ্রথম দ্রষ্টা হলো নেত্র এবং রূপ হলো দৃশ্য, তারপর মন হলো দ্রষ্টা এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি হলো দৃশ্য। এরপর বুদ্ধি দ্রষ্টা এবং মন দৃশ্য। অন্তিমে বুদ্ধি বৃত্তিগুলিরও যে দ্রষ্টা সেই সাক্ষী (স্বপ্রকাশ আত্মা) কারও দৃশ্য নয়।’

তাৎপর্য হলো, শব্দাদি বিষয়গুলিতে যে পরিবর্তন হয় তাকে ইন্দ্রিয়গুলি জানে। অতএব বিষয় হলো দৃশ্য এবং ইন্দ্রিয়গুলি দ্রষ্টা, মনে যেসব সঙ্কল্প-বিকল্প, চঞ্চলতা-স্থিরতা প্রভৃতি বিকার হয় সেগুলিকে বুদ্ধি জানে। অতএব মন হলো দৃশ্য আর বুদ্ধি দ্রষ্টা। মনের বিকারগুলিকে (জানা, না-জানা অথবা কম জানা প্রভৃতি) স্বয়ং জানে। অতএব বুদ্ধি হলো দৃশ্য আর স্বয়ং (স্বরূপ) হলো দ্রষ্টা। স্বয়ং

অপরিবর্তনীয় এবং নির্বিকার। সেজন্য তা কারও দৃশ্য নয়, সে সকলের দ্রষ্টা।[১]

১। **'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'**

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৪।১৪)

সকলের বিজ্ঞাতাকে কার দ্বারা জানা যাবে ?

২। **'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৭।২৩)

এ ছাড়া আর কোনও দ্রষ্টা নেই।

৩। **'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা'**

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৯)

তিনি সমস্ত জ্ঞেয়কে জানেন। কিন্তু তার জ্ঞাতা কেউ নেই।

~~○~~

---

[১]যেমন, ধনের সম্বন্ধে 'ধনবান' বলা হয় ; কিন্তু ধনের সম্বন্ধ না থাকলে ধনবান (ব্যক্তি) ব্যক্তি থাকে, কিন্তু 'ধনবান' নাম থাকে না। তেমনই, দৃশ্যের সম্বন্ধে দ্রষ্টা বলা হয়, কিন্তু দৃশ্যের সম্বন্ধ না থাকায় দ্রষ্টা তো থাকে কিন্তু 'দ্রষ্টা' এই সংজ্ঞা থাকে না। তাৎপর্য হলো এই যে, এক চিন্ময় তত্ত্বই (বোঝার জন্য) দৃশ্যের সম্বন্ধে দ্রষ্টা, সাক্ষ্যের সম্বন্ধে সাক্ষী, করণের সম্বন্ধে কর্তা এবং শরীরের সম্বন্ধে শরীরী কথিত হয়। বাস্তবে সেই তত্ত্বের কোনও নাম নেই। তা কেবল অনুভবরূপ।

# করণরহিত (করণনিরপেক্ষ) পরমাত্মতত্ত্ব

যার দ্বারা ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, যা ক্রিয়াকে উৎপন্ন করে তাকে 'কারক' বলা হয়—'**ক্রিয়াজনকত্বং কারকত্বম্**'। কারক ছ'টি হয়ে থাকে— কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ।[১] এই ছ'টি কারক ক্রিয়ার সিদ্ধি নিমিত্ত কার্যান্বিত হয়, পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য হয় না। তার কারণ হলো পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি ক্রিয়াসাধ্য নয়। সব ক'টি কারকই প্রকৃতিতে থাকে এবং সেগুলি প্রকৃতির কার্য ; কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বে প্রকৃতির অতীত। সুতরাং কোনও কারকই পরমাত্মতত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। সেইজন্য পরমাত্মতত্ত্ব হলো করণনিরপেক্ষ (করণরহিত) অর্থাৎ তা কর্তানিরপেক্ষ, কর্মনিরপেক্ষ, করণনিরপেক্ষ, সম্প্রদান-নিরপেক্ষ, অপাদাননিরপেক্ষ এবং অধিকরণনিরপেক্ষ।[২]

**শঙ্কা**—পরমাত্মতত্ত্ব যখন সমস্ত কারক থেকে নিরপেক্ষ তাহলে আবার করণনিরপেক্ষ বলার অর্থ কী ?

**সমাধান**— ক্রিয়ার সিদ্ধি করণের প্রয়োগের পর তাৎক্ষণিকই হয়ে থাকে।[৩] অতএব ক্রিয়ার সিদ্ধিতে করণ অত্যন্ত উপকারক— '**সাধক-তমং করণম্**' (পাণি.অ.১।৪।৪২)। যথা, রামের বাণের দ্বারা বালী নিহত হলো—এই বাক্যে 'বাণ' হলো করণ ; কেননা বালীর মৃত্যুর হেতু

---

[১]কর্তা কর্ম চ করণং চ সম্প্রদানং তথৈব চ।
অপাদানাধিকরণে চেত্যাহুঃ কারকাণি ষট্॥

[২]যা করণরহিত তা করণসাপেক্ষ হতে পারে না, কিন্তু করণনিরপেক্ষ হতে পারে। অতএব এখানে যাঁরা করণসাপেক্ষতার সংস্কারযুক্ত তাঁদের বোঝাবার জন্য (করণনিরপেক্ষ সাধনার দৃষ্টিতে) পরমাত্মতত্ত্বকে 'করণনিরপেক্ষ' বলা হয়েছে। বাস্তবে পরমাত্মতত্ত্ব হলো 'করণরহিত'।

[৩]ক্রিয়ায়াঃ ফলনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণং তত্তদা স্মৃতম্॥ (বাক্যপদীয় ৩।৭।৯০)

হলো বাণ। যদিও বাণ চালাতে ধনুক, তার গুণ, হাত প্রভৃতি কয়েকটি কারক হলো হেতু, তাহলেও বালী বাণেতেই মারা গিয়েছিল, ধনুক প্রভৃতিতে নয়। অতএব পরমাত্মতত্ত্বকে করণনিরপেক্ষ বলার তাৎপর্য হলো এই যে, যা ক্রিয়াসিদ্ধ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই 'করণ'ও যখন তার সিদ্ধিতে হেতু নয়, তখন অন্য কারক তার প্রাপ্তিতে হেতু কি করে হতে পারে ? এইজন্য করণনিরপেক্ষ বলায় পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃই কারক-নিরপেক্ষ সিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা সেটি কারকগুলির অতীত।

কারকগুলির মধ্যে 'কর্তা' হলো প্রধান ; কেননা সমস্ত ক্রিয়া কর্তার অধীনই হয়ে থাকে। অন্য কারকগুলি তো ক্রিয়ার সিদ্ধিতে সহায়কমাত্র হয়ে থাকে। সেইজন্য কর্তা হলো স্বতন্ত্র—**'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'**, (পাণি.অ.১।৪।৫৪)। পরমাত্মতত্ত্ব কোনও ক্রিয়ারই কর্তা নয়। গীতা পরমাত্মতত্ত্বে কর্তৃত্বের নিষেধ বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্নভাবে করেছে ; যথা—

১। **শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥**

(গীতা ১৩।৩১)

'এই আত্মা শরীরে অবস্থিত থেকেও কোনও কিছু করে না এবং কোনও কিছুতে লিপ্তও হয় না।'

২। **প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।**
**যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥** (গীতা ১৩।২৯)

'যিনি ক্রিয়াসমূহকে সকল প্রকারে প্রকৃতির দ্বারা সিদ্ধ হতে দেখেন অর্থাৎ প্রকৃতিকেই কর্তা দেখেন এবং স্বরূপকে অকর্তা দেখেন (অনুভব করেন) তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা।'

৩। **তত্রৈবং যতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।**
**পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥** (গীতা ১৮।১৬)

'যিনি কর্মসমূহের বিষয়ে শুদ্ধ আত্মাকে কর্তা বলে মানেন, সেই দুর্মতি ঠিক বোঝেন না, কেননা তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধ নয়।'

৪। **প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।**

**অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥** (গীতা ১৩।২৭)

'কর্মসমূহ সকল প্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কর্তা হলো গুণ ; কিন্তু অহঙ্কারের দ্বারা মোহগ্রস্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট অজ্ঞানী মানুষ 'আমি হলাম কর্তা'—এইরকম মনে করে।'

৫। **তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।**

**গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥** (গীতা ৩।২৮)

'হে মহাবাহো ! গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তত্ত্বগতভাবে জানেন যেসব মহাপুরুষ তাঁরা 'সমস্ত গুণই গুণের মধ্যে কার্যান্বিত হচ্ছে'—এইটি মেনে নিয়ে তাতে আসক্ত হন না।'

৬। **নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।**

**গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥**

(গীতা ১৪।১৯)

'যখন বিবেকবান (বিচারকুশল) মানুষ তিনটি গুণ ছাড়া অন্য কিছুকে কর্তা বলে মনে করেন না এবং নিজেকে গুণের ঊর্ধ্বে (সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত) অনুভব করেন তখন তিনি আমার স্বরূপকে লাভ করেন।'

৭। **'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৫।৯)

'সকল ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়গুলিতে কার্যান্বিত হচ্ছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিই কর্তা।'

৮। **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।'**

(গীতা ৫।৮)

'তত্ত্বকে জ্ঞাত সাংখ্যযোগী 'আমি (নিজে) কিছুই করি না' —এইরকম মনে করবেন অর্থাৎ অনুভব করবেন।'

—এইভাবে কোথাও প্রকৃতিকে, কোথাও গুণসমূহকে এবং কোথাও ইন্দ্রিয়গুলিকে কর্তা বলার তাৎপর্য হলো এই যে, পরমাত্মতত্ত্বে কর্তৃত্ব

নেই। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব হলো সংসারের স্বরূপ। পরমাত্মতত্ত্ব যখন কর্তাই নয়, তখন অন্য কারক তার কাছে কি করে পৌঁছাবে ? সুতরাং তার প্রাপ্তি করণের দ্বারা হয় না, করণের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদ হলেই হয়। উপনিষদে বলা হয়েছে—

**১। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ।**

(কেনোপনিষদ্ ১।৩)

'না নেত্রেন্দ্রিয়, না বাণী, না মন—কোনো কিছুই সেই ব্রহ্ম পর্যন্ত যেতে পারে না।'

**২। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।**
**তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥**

(কেনোপনিষদ্ ১।৫)

'যাকে মনের (অন্তঃকরণের) দ্বারা মনন করা যায় না, প্রত্যুত মন যার দ্বারা মনন করেছে বলা যায় তাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানো। এইরূপে যাঁকে এই লোকসকল উপাসনা করে অর্থাৎ অন্তঃকরণের দ্বারা যাঁর জ্ঞান হয়, তা ব্রহ্ম নয়।'

**৩। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।**

(কঠোপনিষদ্ ২।৩।১২)

'সেই পরমাত্মতত্ত্ব বাণীর দ্বারা, মনের দ্বারা এবং নেত্রের দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না।'

**৪। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।**
**যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণূতে তনুং স্যাম্।**

(কঠোপনিষদ্ ১।২।২৩ ; মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৩)

'এই আত্মতত্ত্ব (পরমাত্মা) না তো প্রবচনের দ্বারা, না বুদ্ধির দ্বারা, না বহুবার শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারে। ইঁনি যাকে স্বীকার করে নেন তিনিই প্রাপ্ত হতে পারেন, কেননা ইঁনি (পরমাত্মা) তার নিকট নিজের যথার্থ স্বরূপ প্রকট করে দেন।'

সেই সাধকই পরমাত্মাকে লাভ করেন যাঁকে তিনি স্বয়ং স্বীকার করে নেন এবং তিনিও তাঁকেই স্বীকার করেন যিনি কেবল তাঁকেই পেতে চান—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'**। (গীতা ৪।১১)

তাৎপর্য হলো পরমাত্মা সাধকের উৎকট অভিলাষায় প্রাপ্ত হন, শ্রবণাদি সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হন না। শাঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে—

**'যমেব পরমাত্মানমেবৈষ বিদ্যান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি তেন বরণেনৈষ পরমাত্মা লভ্যো নান্যেন সাধনান্তরেণ, নিত্যলব্ধস্বভাবত্বাৎ'**।

'যে পরমাত্মাকে এই বিদ্বান বরণ করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত করতে ইচ্ছা করেন সেই বরণ করার দ্বারাই এই পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য। নিত্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে এই পরমাত্মা অন্য কোনও সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারেন না।'

গীতায় আছে—**'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ'** (২।২৯)। 'এঁকে শুনেও কেউ জানে না।' তাৎপর্য হলো যেমন সংসারে কেবল শুনলেই বিবাহ হয় না, স্ত্রী এবং পুরুষ একে অপরকে পতি-পত্নীরূপে স্বীকার করলে তবেই বিবাহ হয়, তেমনই কেবল শুনলেই পরমাত্মাকে কেউ জানতে পারে না, শোনার পরে যখন স্বয়ং তাঁকে স্বীকার করবে অথবা তাঁতে স্থিত হবে কেবল তখনই স্বয়ং-এর দ্বারা তাঁকে জানবে। অতএব শুনে শুনে মানুষ জ্ঞানের কথা শিখতে পারে, শোনাতে পারে, লিখতে পারে, কিন্তু অনুভব করতে পারে না।

'আমি আছি'—এইভাবে নিজের অস্তিত্ব (সত্তা)-এর যে অনুভূতি হয়ে থাকে তা কোনও করণের দ্বারা হয় না। তাৎপর্য হলো, নিজের অস্তিত্ব কোনও করণের অধীন নয়, বরং তা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব যখন নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করবার জন্য কোনও করণের প্রয়োজন হয় না, তাহলে পরমাত্মতত্ত্ব কি নিজের চেয়েও দুর্বল যে তাকে অনুভব

করতে করণের প্রয়োজন হবে ?

সত্তা (তত্ত্ব) হলো করণরহিত—প্রত্যেকেরই সুষুপ্তিতে এর অস্পষ্ট অনুভূতি হয়ে থাকে।[১] সুষুপ্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সবকিছু অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়, কিন্তু স্বয়ং থাকে। তাই সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে (তার স্মৃতি থেকে) আমরা বলে থাকি যে ঘুম এত সুখদায়ক ছিল যে আমাদের কিছুই মনে নেই। এই স্মৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সুখ অনুভব করে এবং যে বলে যে 'কিছুই মনে নেই' সে তো ছিল। তা না হলে কে সুখকে অনুভব করেছিল এবং কে বলেছিল কিছুই মনে নেই' ?

একজন মহিলার নথ (নাকছাবি) কূয়ায় পড়ে গিয়েছিল। সেটিকে বার করবার জন্য একজন লোক কূয়ায় নামল এবং জলের ভিতর নথটিকে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তার হাতে নথটি ঠেকল এবং সে খুব খুশি হলো। কিন্তু তখন সে কিছু বলতে পারল না, কেননা বাণী (অগ্নি) এবং জলের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আছে। জলের থেকে বেরিয়ে এসেই সে বলতে পারল যে নথটি পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে সুষুপ্তিতে করণগুলি লীন হয়ে যাবার পর মানুষ সুখ তো অনুভব করে, কিন্তু তা ব্যক্ত করতে পারে না, কেননা তখন বলার সাধন (করণ, হাতিয়ার) থাকে না। সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠেই তার সুষুপ্তির সুখের স্মৃতি উৎপন্ন হয়। স্মৃতি অনুভূতিজনিত হয়ে থাকে—'**অনুভবজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ**'।

এইভাবে সুষুপ্তিতে করণগুলির অবিদ্যমানতার অনুভূতি সকলের হয়ে থাকে, কিন্তু নিজের অবিদ্যমানতার অনুভূতি কারও কখনও হয় না। করণ আমাদের ছাড়া থাকতে পারে না, কিন্তু আমরা (স্বয়ং) করণগুলি ছাড়া থাকতে পারি এবং আছি। কেবল সত্তা, কেবল

---

[১]সত্তার স্পষ্ট অনুভূতি করণের লীন হওয়ার পর (সুষুপ্তিতে) হয় না, বরং করণগুলি থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে (জাগ্রত-সুষুপ্তিতে) তা হয়।

চিন্ময়তাই হলো আমাদের স্বরূপ। এই নিত্য সত্তার কোনও কিছুরই প্রত্যাশা নেই, কিন্তু সকলেরই সত্তার জন্য প্রত্যাশা আছে। অতএব করণগুলির দ্বারা সত্তার বোধ হয় না, তা হয় করণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে।

একটি মার্মিক কথা হলো এই যে, যে-রীতিতে সাংসারিক বস্তুগুলির প্রাপ্তি ঘটে সেই রীতিতে পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি হয় না। সংসারের কোনও কাজই করণ ছাড়া হয় না। সব কাজই করণের দ্বারাই হয় ; এর কারণ হলো, অপ্রাপ্ত সাংসারিক বস্তুর প্রাপ্তি ক্রিয়ার দ্বারাই হয়ে থাকে, কিন্তু নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি ক্রিয়ার দ্বারা হয় না—**'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'** (মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।১২) ; কেননা সেই তত্ত্ব হলো ক্রিয়ার অতীত। অতএব তার প্রাপ্তির জন্য করণের প্রয়োজন নেই।

যেমন কণ্ঠী গলায় আছে এবং গলা কণ্ঠীতে আছে। কিন্তু এই ভুল ধারণা হলো যে কণ্ঠীটি হারিয়ে গিয়েছে। এই ধারণা (অজ্ঞান) দূর করার জন্য কোনও করণের প্রয়োজন নেই, বরং জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান কণ্ঠীকে তৈরি করে না, কিন্তু ভুল ধারণ দূর করে। অতএব কোনও বস্তু নির্মাণ করতে, সৃষ্টি করতে করণের প্রয়োজন তো হয়, কিন্তু যা স্বতঃসিদ্ধ (আগে থেকেই বিদ্যমান) তত্ত্ব, তাতে করণের কী প্রয়োজন?

**খোয়া করে সো বাবরা, পায়া কহে সো কূর।**
**পায়া খোয়া কুছ নহীঁ, জ্যোঁ-কা-ত্যোঁ ভরপুর॥**

পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি স্বয়ং-এর হয়, করণের নয়। অতএব পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করার জন্য আমরা যত বেশি করণের প্রয়োজনীয়তা মেনে নেব, পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতিতে ততই দেরি হবে। বাস্তবে নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্বেরই প্রাপ্তি আমাদের করতে হবে এবং নিত্যনিবৃত্তের নিবৃত্তি করতে হবে। নতুন কিছু করতে হবে না। অতএব এতে কোনও করণ অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রত্যাশা নেই। এইজন্য গীতা বলেন—

১। **আত্মনেবাত্মনা তুষ্টঃ** (গীতা ২।৫৫)

'নিজেই নিজেতে, নিজেই নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে।'

২। **যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।**
**আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥** (গীতা ৩।১৭)

'যে মানুষ নিজেই নিজের মধ্যে রমণ করে তথা নিজের মধ্যে তৃপ্ত এবং নিজেই নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট, তার কাছে কোনও কর্তব্য নেই।'

৩। **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** (গীতা ৬।৫)

'নিজের দ্বারাই নিজেকে উদ্ধার করবে।'

৪। **যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।** (গীতা ৬।২০)

'যে অবস্থায় (স্বয়ং) নিজেই নিজের মধ্যে, নিজেই নিজেকে দেখতে দেখতে, নিজেই নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে যায়।'

৫। **'পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা'** (গীতা ১৩।২৪)

'নিজেই নিজে থেকে নিজের মধ্যে পরমাত্মতত্ত্বকে অনুভব করেন।'

৬। **'পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্'** (গীতা ১৫।১১)

'নিজেই নিজের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্বকে অনুভব করেন।' অর্জুনও ভগবানকে বলেছেন—

৭। **'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।'** (গীতা ১০।১৫)

'হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ং নিজের দ্বারা নিজে নিজেকে জানেন।'

উপনিষদে আছে—

১। **'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।২৩)

'আত্মাতেই আত্মাকে দেখেন।'

২। **'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬)

'ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।'

১। **আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।** (কেনোপনিষদ্ ২।৪)

'অমৃতত্ব নিজে নিজেই প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার দ্বারা তো শুধুমাত্র অজ্ঞানান্ধকারকে নিবৃত্ত করার সামর্থ্য পাওয়া যায়।' কেনোপনিষদের উপরোক্ত মন্ত্রের শঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে—

**'আত্মনা বিন্দতে স্বেনৈব নিত্যাত্মস্বভাবেনামৃতত্বং বিন্দতে। নালম্বনপূর্বকম্। বিন্দত ইতি আত্মবিজ্ঞানাপেক্ষম্। যদি হি বিদ্যোৎ পাদ্যমমৃতত্বং স্যাদনিত্যং ভবেৎ কর্মকার্যবৎ। অতো ন বিদ্যোৎ পাদ্যম্। যদি চাত্মনৈবামৃতত্বং বিন্দতে কিং পুনর্বিদ্যয়া ক্রিয়ত ইত্যুচ্যতে। অনাত্মবিজ্ঞানং নিবর্তয়ন্তী সা তন্নিবৃত্ত্যা স্বাভাবিকস্যামৃতত্বস্য নিমিত্তমিতি কল্প্যতে। যত আহ বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতে।'**

'অমরত্ব তো আত্ম থেকে— নিজের নিত্যাত্মস্বভাব থেকেই প্রাপ্ত করা হয়, কারও আশ্রয় থেকে নয়। 'বিন্দতে'— এটি থেকে এই কথাই বোঝা উচিত যে তার প্রাপ্তি হয় আত্মবিজ্ঞানের প্রতীক্ষা থেকে। যদি অমৃতত্ব বিদ্যা থেকে সৃষ্টি যোগ্য হতো তাহলে তা কর্মফলের মতো অনিত্য হয়ে যেত। এইজন্য তা বিদ্যার দ্বারা উৎপাদ্য নয়। যদি বলা হয় যে অমৃতত্ব যখন স্বতঃই প্রাপ্ত হয় তখন বিদ্যা সেখানে কী করে ? তাহলে আমাদের এই কথা বলতে হবে যে সেই অনাত্মবিজ্ঞানকে নিবৃত্তকারী যে নিবৃত্ত তার দ্বারা স্বাভাবিক অমৃততত্ত্বের হেতু সৃষ্টি হয়। কেননা 'বিদ্যার দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারকে নিবৃত্ত করার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়'—এমনও বলা হয়েছে।'

**'ধনসহায়মন্ত্রৌষধিতপোয়োগকৃতং বীর্যং মৃত্যুং ন শক্নোত্যভিভবিতুম্ অনিত্যবস্তুকৃতত্বাৎ ; আত্মবিদ্যাকৃতং তু বীর্যমাত্মনৈব বিন্দতে, নান্যেন ইত্যতোঽনন্যসাধনত্বাদাত্মবিদ্যাবীর্যস্য তদেব বীর্যং মৃত্যুং শক্নোত্যভিভবিতুম্।'**

'ধন, সহায়, মন্ত্র, ওষধি, তপ এবং যোগ থেকে প্রাপ্ত হয় এমন যে বীর্য (সামর্থ্য), অনিত্য বস্তুর দ্বারা কৃত হওয়ায় তা মৃত্যুকে পরাভূত

করতে সমর্থ নয়। কিন্তু আত্মবিদ্যা দ্বারা কৃত বীর্য তো আত্মার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, অন্য কোনও ভাবে হয় না। এইজন্য আত্মবিদ্যাজনিত বীর্য অন্য কোনও সাধনায় পাওয়া যায় না। অতএব সেই বীর্যই মৃত্যুকে পরাভূত করতে পারে।'

তাৎপর্য হলো এই যে, পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি স্বয়ং-এরই হয়ে থাকে, করণের হয় না। অতএব তার প্রাপ্তির জন্য অন্তঃকরণের প্রয়োজন নেই বরং প্রয়োজন হলো অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। যার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করতে হবে সে কেমন, আর কেমন নয়, তাতে কী প্রয়োজন !

**কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।**
**বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥**

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।৪)

'সংসারের সকল বস্তুকে বাণীর দ্বারা বলা যেতে পারে এবং মনের দ্বারা চিন্তা করা যেতে পারে, অতএব সেগুলি অসত্য। যখন দ্বৈত নামের কোনও বস্তুই নেই তখন তার ভালই বা কী এবং মন্দই বা কী ?'

**শঙ্কা**—অন্তঃকরণকে শুদ্ধ না করলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হবে কী করে ?

**সমাধান**—বাস্তবে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য অন্তঃকরণকে প্রয়োজন মনে করা এবং তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করাই হলো অন্তঃকরণের অশুদ্ধি। অন্তঃকরণের দ্বারা বোধ হয় না, তা হয় বিবেকের জাগৃতির ফলে এবং তা হয় স্বয়ং-এর দ্বারা। যেমন কলম ভাল হলে লেখার অক্ষর তো ভাল হতে পারে কিন্তু লেখক ভাল হয়ে যান না। তেমনই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে ক্রিয়াগুলি শুদ্ধ হতে পারে কিন্তু তাতে কর্তা শুদ্ধ হয়ে যায় না। কর্তা শুদ্ধ হয় অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে। কেননা অন্তঃকরণের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেওয়াই হলো অশুদ্ধির মূল কারণ। 'আমার-ভাব' (মমতা)-ই হলো মল—**'মমতা মল জরি জাই'** (শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ ক)।

গীতায় আছে—

**'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্চতে'**। (গীতা ২।৪৮)

—এটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য বলেছেন—

**'ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্মাণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিস্তদ্ বিপর্যয়জা অসিদ্ধিস্তয়োঃ সিদ্ধসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্চতে।'**

'ফলতৃষ্ণারহিত পুরুষের দ্বারা কর্ম করলে অন্তঃকরণের শুদ্ধির দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্তি হয় তা হলো সিদ্ধি এবং তার বিপরীত (জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া) হলো অসিদ্ধি। এই সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থেকে অর্থাৎ দুটিকেই সমান মনে করে কর্ম করো। সেটি কোন্ যোগ যাতে স্থিত হয়ে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে ? এই যে সিদ্ধি আর অসিদ্ধিতে সম থাকা, একেই যোগ বলা হয়।'

তাৎপর্য হলো এই যে, সাধককে শুদ্ধি-অশুদ্ধির কথা না ভেবে সম থাকতে হবে। কারণ হলো অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি— দুটিরই যে প্রকাশক (সাক্ষী) সে শুদ্ধি-অশুদ্ধি রহিত (সম)। অতএব অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, বরং সম হওয়ার অর্থাৎ অন্তঃকরণ এবং তার শুদ্ধি-অশুদ্ধি দুটিকে ত্যাগ করে নিজের স্বরূপে স্থিত হওয়া প্রয়োজন। এটি স্বতঃসিদ্ধ। ভাগবতোক্ত হংসগীতাতে ভগবান বলেছেন—

**গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।**
**জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥**
**গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।**
**গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥**

(১১।১৩।২৫-২৬)

'এই চিত্ত বিষয় চিন্তা করতে করতে বিষয়াকার হয়ে যায় এবং বিষয় চিত্তে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এই কথাটি সত্য, তথাপি বিষয় এবং চিত্ত—এই

দুটিই আমার স্বরূপভূত জীবের দেহ (উপাধি) অর্থাৎ আত্মার চিত্ত এবং বিষয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'এইজন্য বারবার বিষয়কে সেবন করতে থাকায় যে চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়ে গিয়েছে এবং বিষয়ও চিত্তে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেই দুটিকে নিজের বাস্তবিক স্বরূপ থেকে অভিন্ন যে-আমি পরমাত্মা, তাতে স্থিত হয়ে ত্যাগ করতে হবে।'

এইরকম কথাই শ্রীরামচরিতমানসে আছে—

**সুনহু তাত মায়া কৃত গুন অরু দোষ অনেক।**
**গুণ য়হ উভয় ন দেখিঅহিঁ দেখিঅ সো অবিবেক॥**

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।৪১)

**প্রশ্ন**—পরমাত্মার সগুণ-সাকার রূপও কি করণনিরপেক্ষ ?

**উত্তর**—হ্যাঁ, পরমাত্মার সগুণ রূপও বাস্তবে নির্গুণ হওয়ায় করণ-নিরপেক্ষই (করণরহিত)।[১] পরমাত্মাকে নির্গুণই বলুন অথবা সগুণই বলুন ; তিনি সত্ত্ব-রজ-তম—তিনটি গুণের সম্পূর্ণরূপে অতীত। তিনি সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য গুণগুলিকে স্বীকার করেন। কিন্তু এরকম করলেও তিনি গুণগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে অতীত ; গুণগুলির দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন।[২] অতএব পরমাত্মার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের রূপও তত্ত্বগতভাবে নির্গুণই।

---

[১]সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ (গীতা ১৩।১৪)

'সেই পরমাত্মা সকল ইন্দ্রিয় থেকে রহিত এবং সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের প্রকাশক। তিনি আসক্তিরহিত এবং সমগ্র সংসারের ভরণপোষণকারী তথা গুণরহিত এবং সকল গুণের ভোক্তা।'

[২]ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ (গীতা ৭।১৩)

'এই তিনটি গুণরূপ ভাবের দ্বারা মোহিত এই সমগ্র জগৎ এই গুণগুলির অতীত অবিনাশী আমাকে জানে না।'

বাস্তবে পরমাত্মা সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার প্রভৃতি সবকিছুই। সগুণ-নির্গুণ প্রভৃতি তো তাঁর বিশেষণ (নাম)। যে পরমাত্মা কখনও গুণগুলির দ্বারা আবদ্ধ হন না, গুণগুলির উপর যাঁর পরিপূর্ণ আধিপত্য আছে সেই পরমাত্মাই তো নির্গুণ। যদি পরমাত্মা গুণগুলির দ্বারা আবদ্ধ এবং তাদের অধীন হন তাহলে তিনি কখনই নির্গুণ হতে পারেন না। নির্গুণ তো তিনিই হতে পারেন যিনি সম্পূর্ণরূপে গুণগুলির অতীত। যিনি সম্পূর্ণরূপে গুণগুলির অতীত সেইরকম পরমাত্মার মধ্যেই সকল গুণ থাকতে পারে। যে নিজেকে গুণের দ্বারা আবদ্ধ বলে মনে করে সেই জীবকেও পরমাত্মার প্রাপ্তি হওয়ার পর গুণাতীত বলা হয়—**'গুণাতীতঃ স উচ্চতে'** (গীতা ১৪।২৫)। তাহলে পরমাত্মা গুণগুলির দ্বারা আবদ্ধ কি করে হতে পারেন ? তিনি তো নিত্য গুণাতীতই।

যখন পরমাত্মা সগুণ-সাকাররূপে প্রকট হন, তখন তাঁর করণও প্রাকৃত (মায়াময়) হয় না বরং চিন্ময় হয়—

**'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্'** (গীতা ৪।৯)

**চিদানন্দময় দেহ তুম্‌হারী। বিগত বিকার জান অধিকারী॥**

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।৫)

ভগবানের সাকার রূপ জীবের শরীরের মতো হাড়-মাংসের (জড়) মতো হয় না। জীবের শরীর তো পাপপুণ্যময়, নশ্বর, রোগগ্রস্ত, বিকারময়, পাঞ্চভৌতিক এবং রজ-বীর্যের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবানের শরীর পাপপুণ্যরহিত, অবিনাশী, রোগশূন্য, বিকার-রহিত, চিন্ময় এবং তা স্বতঃই প্রকটিত হয়। দেবতাদের শরীরও জীবের শরীর অপেক্ষা অধিকতর দিব্য হয়ে থাকে, কিন্তু ভগবানের শরীর দেবতাদের শরীর অপেক্ষাও বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, পরম দিব্যময় ; তাঁকে দর্শন করতে দেবতারাও লালায়িত হন—

**দেবা অপস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥** (গীতা ১১।৫২)

ভগবানের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ— সবকিছুই চিন্ময়। ভগবানের একটি নাম হলো **'আত্মারামগণাকর্ষী'**। ভগবানের চরণ-

কমলের গন্ধে সদা সর্বদা পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত সনকাদির হৃদয়েও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল—

**তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।**
**অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥**

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।৪৩)

'প্রণাম করায় সেই কমলনেত্র ভগবানের চরণকমলের পরাগে মিশ্রিত তুলসী মঞ্জরীর বায়ু তাঁদের নাসিকাছিদ্রে প্রবেশ করে সেই অক্ষর পরমাত্মায় নিত্য অবস্থিত জ্ঞানী মহাপুরুষদের চিত্ত এবং শরীরেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল।'

তাৎপর্য হলো এই যে, সগুণ হওয়া সত্ত্বেও পরমাত্মা বাস্তবে নির্গুণই।[১] তাই সগুণের উপাসনাকারী সাধকও তিনটি গুণকে অতিক্রম করে যান—

**মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।**
**স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥** (গীতা ১৪।২৬)

'যে মানুষ অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করে সে এই গুণগুলিকে অতিক্রম করে ব্রহ্মলাভের পাত্র হয়ে যায়।'

সগুণের উপাসনাকারী নির্গুণ ব্রহ্মকে লাভ করবার পাত্র কি করে হয়ে যায় ? এর উত্তরে ভগবান বলেছেন—

---

[১]ভাগবতে সগুণকে নির্গুণও বলা হয়েছে—

বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং স দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্॥ (ভাগবত ১১।২৫।২৫)

'বনে থাকা সাত্ত্বিক, গ্রামে থাকে রাজস, জুয়াঘরে থাকা তামস এবং মন্দিরে থাকা হলো নির্গুণ।'

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা॥ (ভাগবত ১১।২৫।২৭)

'আত্মজ্ঞানের শ্রদ্ধা হলো সাত্ত্বিক, কর্মে শ্রদ্ধা রাজস, অধর্মে শ্রদ্ধা তামস এবং আমার সেবায় শ্রদ্ধা হলো নির্গুণ।'

**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।**

**শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥** (গীতা ১৪।২৭)

'ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, শাশ্বতধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) হলাম আমিই।'

উপরোক্ত শ্লোকের 'ব্রহ্ম তথা অবিনাশী অমৃতের প্রতিষ্ঠা আমি' —এটি নির্গুণ-নিরাকারের কথা [ভগবান '**ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি**' (গীতা ৫।১০) এবং '**ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা**' (গীতা ৯।৪) পদে নিজেকে (সগুণ-সাকারকে) ব্রহ্ম এবং অব্যক্তমূর্তি বলেছেন।] 'শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা আমি'—এটি সগুণ-সাকারের কথা [অর্জুনও ভগবানকে '**শাশ্বতধর্মগোপ্তা**' (গীতা ১১।১৮)] বলেছেন। 'ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা আমি' — এটি সগুণ নিরাকারের কথা [ধ্যানযোগের প্রকরণে এই ঐকান্তিক সুখকে 'আত্যন্তিক সুখ' বলা হয়েছে (৬।২১)]।

এইভাবে একাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকেও '**ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্**' পদে নির্গুণ-নিরাকারের কথা আছে ; '**ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্**' পদে সগুণ-নিরাকারের কথা আছে ; এবং '**ত্বং শাশ্বতধর্মগোপ্তা**' পদে সগুণ-সাকারের কথা আছে। একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

**ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।**

**জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥** (গীতা ১১।৫৪)

'হে শত্রুতাপন অর্জুন ! এইভাবে অনন্য ভক্তির দ্বারাই তত্ত্বগত আমাকে জানা, দেখা এবং প্রবেশ (প্রাপ্তি) করা যেতে পারে।'

—এখানেও ভগবান সগুণ-উপাসনার দ্বারা নির্গুণকে প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। যথা— '**জ্ঞাতুম্**' পদ নির্গুণ-নিরাকারের জন্য, '**দ্রষ্টুম্**' পদ সগুণ-সাকারের জন্য এবং '**প্রবেষ্টুম্**' পদ সগুণ-নিরাকার ও নির্গুণ-নিরাকার উভয়ের জন্যই কথিত হয়েছে। তাৎপর্য হলো সগুণের উপাসনাকে করণসাপেক্ষ বলে মনে হলেও পরিণামে তা হলো করণ-নিরপেক্ষই।

~~o~~

# করণসাপেক্ষ সাধনা

চিত্ত-বৃত্তির পাঁচটি অবস্থা হয়—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। এদের মধ্যে মূঢ় এবং ক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ ধ্যানযোগের অধিকারী নয়। যাদের চিত্ত কখনও পরমাত্মায় নিবিষ্ট হয়, আবার কখনও হয় না এমন বিক্ষিপ্ত বৃত্তি-সম্পন্ন মানুষই ধ্যানযোগের অধিকারী হয়ে থাকে।

বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন সাধক নিজের চিত্তকে সংসার থেকে নিবৃত্ত করে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করার অভ্যাস করেন[১]। যখন তাঁর চিত্ত পরমাত্মায় নিবিষ্ট হয়ে যায় তখন ধ্যানের অবস্থা হয়। ধ্যানাবস্থায় ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়— এই ত্রিপুটি থাকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে ধ্যান করলে যখন ধ্যাতা এবং ধ্যান থাকে না, কেবল ধ্যেয়ই থেকে যায় তখন চিত্তবৃত্তি একাগ্র হয়ে যায়[২]। চিত্তবৃত্তি একাগ্র হলে সম্প্রজ্ঞাত (সবিকল্প) সমাধি হয়[৩]। ধ্যানে এই তিনটি থাকে— ধ্যেয়, ধ্যেয়ের নাম এবং নাম-নামীর সম্বন্ধ। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করলে যখন নামের স্মৃতি না থেকে কেবল নামী (ধ্যেয়) থেকে যায় তখন চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে যায়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে অসম্প্রজ্ঞাত (নির্বিকল্প) সমাধি হয়।

---

[১]যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ (গীতা ৬।২৬)

[২]যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোমপা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ (গীতা ৬।১৯)

'যেমন স্পন্দনহীন বায়ুতে স্থিত দীপের শিখা অকম্পিত হয়ে যায়, যোগ অভ্যাসকারী সংযত চিত্তবিশিষ্ট যোগীর চিত্তের অবস্থাও সেইরকম হয়ে থাকে।

[৩]স্থূল শরীরের দ্বারা ক্রিয়া, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা চিন্তন এবং কারণ শরীরের দ্বারা সমাধি হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ তিনটি শরীরই হলো 'করণ'।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দু'রকমের হয় — সজীব এবং নির্জীব। যখন সংসারের সূক্ষ্ম বাসনা থাকে তখন সজীব সমাধি হয়। সজীব সমাধিতে অহং (আমি ভাব)-এর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। অহং-এর সম্বন্ধ থেকে দুটি অবস্থা হয়—সমাধি এবং ব্যুত্থান। সূক্ষ্ম বাসনার কারণে এই সজীব সমাধিতে অনেক প্রকারের সিদ্ধি (সিদ্ধাই) প্রকট হয়ে যায়। এই সিদ্ধাইগুলি সাংসারিক দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য, কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে হলো বিঘ্ন[১]। যোগী যখন এই সিদ্ধিগুলিতে ফেঁসে না গিয়ে এইগুলির প্রতি উপরাম (বাসনারহিত) হয়ে যান তখন নির্জীব সমাধি হয়। নির্জীব সমাধিতে অহং থেকে, কারণ-শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং যোগী নিজের সহজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যান[২], যার ফলে আর কখনও ব্যুত্থান হয় না। একে সহজ সমাধি, সহজাবস্থা অথবা গুণাতীত অবস্থাও বলা হয়।

যদিও করণসাপেক্ষ সাধনায় করণ (ক্রিয়া)-এর প্রাধান্য থাকে তবু সাধকের লক্ষ্য পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হওয়াতে পরিণামস্বরূপ তাঁর করণের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সাধকের পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি হয়ে যায়।

~~০~~

---

[১]তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ। ( যোগদর্শন ৩।৩৭)

[২]যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ (গীতা ৬।২০)

'যোগরত যে অবস্থায় নিরুদ্ধ চিত্ত উপরাম হয়ে যায় এবং যে অবস্থায় স্বয়ং নিজেই নিজের মধ্যে নিজেই নিজেকে দেখে আপনা-আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।'

## করণনিরপেক্ষ সাধনা

করণনিরপেক্ষ সাধনা গীতার একটি বিশিষ্ট দান। মানুষমাত্রেরই এতে অধিকার আছে। এই সাধনায় সৎ-অসতের বিবেকের প্রাধান্য থাকে। বিবেক হলো অনাদি এবং স্বতঃসিদ্ধ।[১] এটি বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়, তবে এটি বুদ্ধির গুণ নয়। যদিও সৎ-অসতের বিবেক সকল সাধনাতেই আছে তবু করণনিরপেক্ষ সাধনায় সাধক প্রথম থেকেই এই বিবেককে গুরুত্ব দেন, তাতে এই বিবেক তাঁর পথ-প্রদর্শক হয়ে যায়। বিবেককে গুরুত্ব দিলে তাতে জড়ের দাসত্ব অর্থাৎ ক্রিয়া এবং পদার্থের আশ্রয় থাকে না, বরং থাকে এগুলি থেকে নিরপেক্ষতা। জড়ের আশ্রয়ে তত্ত্বের প্রাপ্তি বা বোধ হয় না বরং সংসারের কাজ হয়। জড়ের আশ্রয় সম্পূর্ণরূপে বিবর্জিত হলে জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না আর জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকলে বিবেকই তত্ত্ববোধে পরিণত হয়ে যায়। এইভাবে করণনিরপেক্ষ-সাধনায় বিবেক মুখ্য হয়।

### ক) সৎ-অসতের বিবেক

গীতার উপদেশের প্রারম্ভ বিবেক থেকে হয়েছে, যেমন— একটি আছে শরীর এবং একটি শরীরী (শরীরধারী)। শরীর প্রকৃতির অংশ এবং শরীরী পরমাত্মার অংশ। শরীর এবং শরীরী দুটিই অশোচ্য অর্থাৎ শোক করার অযোগ্য। তাৎপর্য হলো, শরীরীর কখনও নাশ হয় না ; অতএব তার জন্য শোক করার কোনও অর্থ হয় না। শরীর-শরীরীর এই প্রভেদকে জানেন যে বিবেকী পুরুষ তিনি কোনও মৃত অথবা জীবিত

---

[১]গীতায় আছে—'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'।

(গীতা ১৩।১৯)

'প্রকৃতি এবং পুরুষ—দুটিকেই তুমি অনাদি জানবে।' অতএব প্রকৃতি এবং পুরুষ যেমন অনাদি তেমনই এই দুটির ভেদ (বিবেক)ও হলো অনাদি।

প্রাণীর জন্য কখনও চিন্তা-শোক করেন না। তাঁর দৃষ্টি নশ্বর শরীরের দিকে না গিয়ে অবিনশ্বর শরীরীর দিকেই থাকে। তিনি দেখেন যে, শরীর আগেও ছিল না এবং পরেও থাকবে না, কিন্তু তাঁর মধ্যে অবস্থিত শরীরী আগেও ছিল, পরেও থাকবে। তাই শরীরের আসা-যাওয়ার অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হওয়ার কোনও প্রভাব তার উপর পড়ে না। কারণ হলো, যেমন শরীর বাল্যাবস্থা থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে চলে যায়, কিন্তু স্বয়ং যেমনকার তেমনই থাকে (এইজন্যই আমরা বলি যে, যে আমি শৈশবে ছিলাম সেই আমিই আজ আছি), তেমনই একটি শরীর থেকে অন্য শরীর প্রাপ্ত হওয়ার পরেও স্বয়ং যেমনকার তেমনই থাকে। তাৎপর্য হলো অবস্থা বদলায়, স্বয়ং বদলায় না (২।১১-১৩)।

শরীর যেমন নশ্বর এবং পরিবর্তনশীল তেমনই সকল সাংসারিক পদার্থও নশ্বর এবং পরিবর্তনশীল। সেই পদার্থগুলির প্রতি আমাদের অনুকূল ভাবনা হয়ে গেলে সেগুলি সুখদায়ক হয়ে যায় আর প্রতিকূল ভাবনা হলে সেগুলি দুঃখদায়ী হয়ে ওঠে। শরীরাদি সকল প্রাকৃত পদার্থ আসা-যাওয়া করে, সেগুলির সৃষ্টি ও বিনাশ হয়। সেগুলি এক মুহূর্তও স্থির থাকে না। যে মানুষের উপর এই প্রাকৃত পদার্থগুলির আসা-যাওয়ার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না, তিনি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন (২।১৪-১৫)।

নশ্বর শরীরাদি পদার্থগুলি 'অ-সৎ' এবং অবিনাশী শরীরী 'সৎ'। অ-সতের তো সত্তা নেই এবং সৎ অবিদ্যমান হয় না। অসতের যে সত্তা প্রতীত হয় তাও বাস্তবে সৎ-এর সত্তা থেকেই হয়। অতএব সৎ এবং অসৎ—এই দুটির তত্ত্বকে যে মহাপুরুষ জানেন তিনি এক সৎ-তত্ত্বেরই অনুভব করেন অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে এক সৎ-তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর স্বতন্ত্র সত্তা (অস্তিত্ব) নেই। এই সৎ-তত্ত্ব সমগ্র সংসারে পরিব্যাপ্ত। সংসার বিনষ্ট হলেও এই সৎ-তত্ত্বের কখনও বিনাশ হয় না। কিন্তু যত শরীর দেখা এবং জানা যায় সেগুলি সবই অ-সৎ। প্রতিমুহূর্তে

সেগুলি বিনষ্ট হচ্ছে। সেগুলিকে 'নশ্বর' বলা হয় ; কেননা বিনাশ ছাড়া সেগুলিতে আর কিছুই নেই। যেমন শরীরের বিনাশী-ভাব নিত্য, তেমনই তাতে অবস্থানকারী শরীরীর অবিনাশী-ভাবও নিত্য (২।১৬-১৮)।

এই শরীরী কাউকে নিহত করে না এবং কারও দ্বারা নিহত হয় না, অর্থাৎ এটি হত্যা করা এবং হত হওয়ার ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে একে হত্যাকারী ও হত বলে মনে করে সেই মানুষ বাস্তবে একে জানে না। কেননা এই শরীরী জন্ম-মৃত্যুরহিত, সদা-সর্বদা অবস্থানকারী, শাশ্বত এবং অবিনাশী। শরীরে তো ছয়টি বিকার হয়ে থাকে—সৃষ্ট হওয়া, সত্তাবিশিষ্ট দেখান, বদলান, বৃদ্ধি, ক্ষীণ হওয়া এবং বিনষ্ট হওয়া। কিন্তু শরীরী এই ছ'টি বিকার থেকে মুক্ত। সেজন্য শরীরের মৃত্যু হলেও এর মৃত্যু হয় না। যে মানুষ শরীরীকে এইভাবে ছয়টি বিকার থেকে মুক্ত বলে জানেন তিনি কি করে কাউকে হত্যা করবেন এবং হত্যা করাবেন ? তাৎপর্য হলো, শরীরী কোনও ক্রিয়ারই কর্তা (যে করে) নয় এবং কারয়িতা (অপরকে দিয়ে করানো) নয় (২।১৯-২১)।

জন্ম-মৃত্যু শরীরেরই হয়, শরীরীর হয় না। যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করলে মানুষের মৃত্যু হয় না এবং নতুন কোনও বস্ত্র ধারণ করলে তার জন্ম হয় না, তেমনই পুরাতন শরীরকে পরিত্যাগ করলে শরীরীর মৃত্যু হয় না এবং নতুন শরীরে প্রবেশ করলে শরীরীর (শরীরধারীর) জন্ম হয় না। শরীর বদলালেও শরীরী যেমনকার তেমনই থেকে যায়। এই শরীরীকে শস্ত্র ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। কারণ এই শরীরী অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। তাৎপর্য হলো, কাটা, জ্বালা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সংসারেই হয়ে থাকে। শরীরীর উপর এই ক্রিয়াগুলির বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না। এই শরীরী সকল কালে

এবং সকল বস্তুতে বিদ্যমান। এতে আসা-যাওয়া এবং নড়াচড়ার ক্রিয়া নেই। দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতি কোনও কিছুই তো থাকে না, কিন্তু শরীরী থাকে। এই শরীরী স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—তিনটি শরীরের থেকেই অতীত। এই শরীরগুলি তো থাকে না, কিন্তু শরীরী থাকে (২।২২-২৫)।

শরীর আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং মধ্যবর্তী সময়ে এর প্রতিক্ষণ সৃষ্টি ও বিনাশ হচ্ছে। এটি নিত্যজাত এবং নিত্যমৃত। কারণ এটি প্রতিমুহূর্তে আগেকার অবস্থা ত্যাগ করে নতুন অবস্থা ধারণ করতে থাকে। আগের অবস্থা ত্যাগ করা হলো মৃত্যু এবং নতুন অবস্থা ধারণ করা হলো জন্ম। এইভাবে নিত্যজাত ও নিত্যমৃত হওয়ার কারণে বাস্তবে এই শরীরের স্থিতিই নেই। সৃষ্টি-বিনাশের পরম্পরাকেই স্থিতি বলা হয়। এইজন্য যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই। কেউ তার অন্যথা (নিবারণ) করতে পারে না (২।২৬-২৭)।

শরীর প্রথমেও অব্যক্ত ছিল এবং পরেও অব্যক্ত হয়ে যাবে, কেবল মধ্য কালে ব্যক্ত দৃষ্ট হয়। কিন্তু শরীরী ব্যক্ত-অব্যক্ত ভাব থেকে মুক্ত। বাস্তবে শব্দের দ্বারা এই শরীরীর বর্ণনা হতে পারে না। যেমন শারীরিক বস্তুগুলিকে দেখা, বলা, শোনা এবং জানা যায় তেমনভাবে এই শরীরীকে দেখা, বলা, শোনা এবং জানা যায় না। কারণ এটি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিষয় নয়। জানা, বলা, শোনা প্রভৃতি শক্তিগুলি সংসারের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। শরীরীকে তো স্বয়ং-এর দ্বারা জানা যেতে পারে ; কারণ এটি হলো করণ-নিরপেক্ষ তত্ত্ব (২।২৮-২৯)।

এইভাবে শরীরের অ-বিনাশত্ব যে জেনে নেয় তার মধ্যে শোক, চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি বিকার হয় না। যদি তার মধ্যে এই সব বিকার হয়ে থাকে তাহলে সে বাস্তবিকভাবে শরীরীকে জানে না। তাৎপর্য হলো, অ-সতের সত্তা নেই এবং সত্তার অবিদ্যমানতা নেই—এই কথাটি

কেবল শেখা নয়, তার অনুভূতি প্রয়োজন। কেবল শেখার দ্বারা শোক দূর হয় না, অনুভব করলে তবেই তা দূর হয়। অনুভূতি হলে শোক টিঁকতে পারে না (২।৩০)।[১]

এইভাবে শরীর এবং শরীরীর প্রভেদকে বোঝা এবং বুঝে নিয়ে সেটিকে স্বীকার করা হলো নিজের বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা করা। বিবেকে সৎ এবং অ-সৎ দুই থাকে। বিবেককে শ্রদ্ধা করলে সৎ-এর প্রতি শ্রদ্ধা এবং অসতের প্রতি অশ্রদ্ধা স্বতঃই হয়ে যায়। অ-সৎকে অশ্রদ্ধা করলে সাধক অ-সৎ থেকে উপরে উঠে যান এবং স্বতঃপ্রাপ্ত সৎ-তত্ত্বকে লাভ করেন।

সৎ হলো নিজের স্বরূপ এবং অ-সৎ প্রকৃতির স্বরূপ। সাধক যখন নিজের বিবেককে শ্রদ্ধা করেন অর্থাৎ বিবেককে গুরুত্ব দেন তখন তাঁর সাধনায় সৎ (স্বয়ং)-এর প্রাধান্য হয় আর যখন তিনি নিজের বিবেককে শ্রদ্ধা করেন না তখন তাঁর সাধনায় অ-সৎ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির প্রাধান্য হয়।

---

[১]গীতায় ভগবান উপদেশের শুরুতে, মধ্যখানে এবং শেষে তিন জায়গাতেই চিন্তা-শোক না করার কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য হলো এই যে, সুখের এবং দুঃখের কারণ বহিস্থ কোনও বস্তু বা পরিস্থিতি প্রভৃতি নয়, বরং যার মধ্যে চিন্তা-শোক নেই সেই প্রকৃতপক্ষে সুখী এবং যার মধ্যে চিন্তা-শোক আছে সে বাস্তবে দুঃখী। এমনটি দেখাও যায় যে অত্যধিক ধনসম্পদ থাকলেও ধনী দুঃখিত থাকেন এবং ধনসম্পদ না থাকলেও তত্ত্বজ্ঞ সাধু-মহাত্মারা সুখী থাকেন। এইজন্য ধনী ব্যক্তিরা সুখ-শান্তির জন্য সাধু-মহাত্মাদের কাছে যান, কিন্তু সুখ-শান্তির জন্য সাধু-মহাত্মারা ধনীদের কাছে যান না। কিন্তু এখন লোকেরা ভিতরের শান্তির প্রতি যত্নশীল না হয়ে বাইরের বস্তু (ধনসম্পদ)-এর প্রতি মন দেয়। সেগুলিই সংগ্রহ করে এবং বাইরের সুখকে সুখ মেনে নিয়ে তার জন্য নিবীর্যকরণ, গর্ভপাত-এর মতো মহাপাপ করে। তারা যদি বাইরের সুখকে প্রত্যাশা না করে ভিতরের সুখ-শান্তির প্রতি যত্নশীল হয় তাহলে তারা সবাই জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে, চিরকালের জন্য সুখী হয়ে যাবে।

## খ) বিবেকের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের অন্তঃকরণে এই কথাটি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আছে যে, যা কিছু হবে তা করার ফলেই হবে। পরমাত্মার প্রাপ্তি তখনই হবে যখন তার জন্য উদ্যোগ করা হবে। যখন সংসারের কোনও কাজই কিছু না করলে হয় না, তখন সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি কিছু না করলে কি করে হয়ে যাবে ? ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, বেদে, শাস্ত্রে, সন্তদের বাণীতে সর্বত্র পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য প্রায়ই করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে 'যা কিছু হবে, করলেই হবে'—এই কথা তাতেই প্রযোজ্য হয় যা উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং যা অপ্রাপ্ত। যা অনুৎপন্ন এবং নিত্যপ্রাপ্ত, তাতে এই কথা খাটে না। তার কারণ অনুৎপন্ন এবং নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্বের নির্মাণ করতে হয় না, তাকে কোথাও থেকে আনতে হয় না। আসলে তাকে অন্বেষণ করতে হয়, অনুভব করতে হয়। তারই দিকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হয়। তাৎপর্য হলো, কিছু করার বিষয়টি হলো সংসারের জন্য, পরমাত্মার জন্য নয়। সংসারকে প্রাপ্ত করার যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। তার কারণ সংসার সবসময় সকলের কাছে সমানভাবে প্রাপ্ত নয়, কিন্তু পরমাত্মা সকলের কাছে সমানভাবে প্রাপ্ত। সেই পরমাত্মা সকল দেশ, কাল, পাত্র, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে সমানরূপে পরিপূর্ণ। সংসারকে প্রাপ্ত বলে মেনে নিয়েছেন, 'নাস্তি'-কে 'অস্তি' মেনে নিয়েছেন ; তাই পরমাত্মতত্ত্ব (অস্তি)-এর অনুভূতি হচ্ছে না।

উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুগুলির প্রাপ্তি তো কর্ম করলে হয়, কিন্তু অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি নিজের বিবেককে গুরুত্ব দিলে হয়। অতএব পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি ক্রিয়াসাধ্য নয়, বরং তা হলো বিবেকসাধ্য। নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেওয়াই হলো 'করণনিরপেক্ষ সাধনা'।

বিবেক যেমন করণনিরপেক্ষ, সেরূপে করণসাপেক্ষ সাধনা বিবেকনিরপেক্ষ নয়। বাস্তবে কোনও সাধনাই বিবেকনিরপেক্ষ হতে পারে না। কারণ বিবেকের তো ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ক্রিয়ার বিবেককে খুবই প্রয়োজন। বিবেক ছাড়া ক্রিয়া হলো জড় আর ক্রিয়া ছাড়া বিবেক হলো চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞান। এইজন্য কর্ম মানুষকে বেঁধে ফেলে আর বিবেক মুক্তি দেয়—

**'কর্মণ্য বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।'**

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪১।৭)

তপস্যা, যজ্ঞ, দান, তীর্থ, ব্রত প্রভৃতি যত রকমের শ্রেষ্ঠ কর্ম আছে সেগুলির শক্তিতে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। ভগবান বলেছেন—

**ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।**
**এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং তদন্যেন কুরুপ্রবীর॥**

(গীতা ১১।৪৮)

'হে কুরুপ্রবীর ! মনুষ্যলোকে এইরকম বিশ্বরূপবিশিষ্ট আমি বেদাধ্যয়নে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, দানে বা কঠোর তপস্যায় কিংবা কেবল ক্রিয়ার দ্বারা দৃষ্ট হই না। তুমি (কৃপাপাত্র) ছাড়া আর কেউই আমাকে দর্শন করার যোগ্য নয়।'

**নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।**
**শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥** (গীতা ১১।৫৩)

'যেমনভাবে তুমি আমাকে দর্শন করছ আমি ঐভাবে বেদ, তপস্যা, দান এবং যজ্ঞের দ্বারা দৃষ্ট হই না।'

সাধক যখন এইসব তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে যান, তখন তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন—

**বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব**
**দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।**
**অত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা**
**যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥** (গীতা ৮।২৮)

'বেদেতে, যজ্ঞেতে, তপস্যায় তথা দানেতে যত কিছু পুণ্যফলের কথা বলা হয়েছে, যোগী এটি জেনে সেইসব পুণ্যফলকে অতিক্রম করে যান এবং আদিস্থান পরমাত্মাকে লাভ করেন।'

তপস্যাদি করে মানুষ যখন হেরে যায়, হতাশ হয়ে যায়, যখন তার মধ্যে নিজের শক্তির অহঙ্কার থাকে না, তখনই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। তাৎপর্য হলো এই যে, যে-শক্তির অহংকার পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে বাধা হয়, সেই বল যখন তপস্যার দ্বারা ব্যয়িত হয়ে যায়, দগ্ধ হয়ে যায় তখন পরমাত্মার কৃপায় তার প্রাপ্তি হয়। অতএব পরমাত্মা-প্রাপ্তিতে নিজের শক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা, বিদ্বত্তা প্রভৃতির অহঙ্কারই হলো বাধা—

**সংসৃত মূল সূলপ্রদ নানা। সকল সোক দায়ক অভিমানা॥**

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।৭৪।৩)

'**ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাদ্ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ**'। (নারদভক্তিসূত্র ২৭)

'ঈশ্বরেরও অহঙ্কারের প্রতি দ্বেষভাব এবং দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে।'

অর্জুন ভগবানকে বলেছেন—

**ন হি তে ভগবন্‌ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥** (গীতা ১০।১৪)

'হে ভগবান ! আপনার প্রকট হওয়া দেবতারা জানেন না এবং দানবেরাও জানে না।'

তাৎপর্য হলো এই যে, দেবতাদের মধ্যে যে দিব্যতা আছে তা ভগবানকে জানার ক্ষেত্রে কোনও কাজে আসে না। যখন দেবতারাই ভগবানকে জানতে পারেন না, তখন দানবেরা তাঁকে কেমন করে জানবে ? কিন্তু অর্জুন দানবদের দ্বারাও ভগবানকে না জানার কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য হলো, দানবদের কাছে মায়ার অনেক বিশেষ শক্তি আছে ; কিন্তু সেই মায়াশক্তিও ভগবানকে জানার ক্ষেত্রে কোনও কাজে আসে না। অতএব মানুষ, দেবতা, দানব প্রভৃতি কেউই নিজের শক্তি, যোগ্যতা এবং বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে পারে না।

সকল সাধনা মিলিত করলেও পরমাত্মাকে লাভ করা যেতে পারে

না। বস্তুত সকল সাধনার তাৎপর্য হলো নিজেদের অহঙ্কারের শক্তি দূর করা। অতএব সাধনার দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না, বরং তার দ্বারা নিজের শক্তির অহঙ্কার (যা হলো পরমাত্মা প্রাপ্তির বাধা) দূর হয়। সাধনা করতে করতে যখন সাধক এটি জানতে পারেন যে, নিজের সামর্থ্যে কিছুই হবার নয় তখন তাঁর অহঙ্কার দূর হয় আর তৎক্ষণাৎ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়—

**দৌড় সকে তো দৌড় লে, জব লগি তেরী দৌড়।**
**দৌড় থক্যা ধোখা মিট্যা, বস্তু ঠৌড়-কী-ঠৌড়॥**

যাঁর স্ফুরণমাত্রেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় তাঁকে সমগ্র বিশ্বের বিনিময়ে কি কেউ লাভ করতে পারে ? আমাদের অধিকার কেবল তার উপরেই হতে পারে যার মধ্যে আমাদের চেয়ে কম বল, বুদ্ধি, যোগ্যতা, বিদ্বত্তা প্রভৃতি থাকে। পরমাত্মায় শক্তি কম নেই ! তাঁর কাছে অনন্ত শক্তি রয়েছে। তাঁর কাছে নির্বলতা নেই, তা আছে আমাদের মধ্যে। তাই নির্বল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়—

**জব লগি গজ বল অপনো বরত্যো, নেক সর্য়ো নহিঁ কাম।**
**নির্বল হ্বৈ বলরাম পুকার্য়ো, আয়ে আধে নাম॥**
**সুনে রী মৈঁনে নিরবল কে বল রাম॥**

**'অশক্তানাং হরির্বলম্'** (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণ.৩৫।৯৬)

**প্রশ্ন**— কর্মের উপযোগিতা কোথায় ?

**উত্তর**— কর্মের উপযোগিতা সংসারের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য। সংসার থেকে উপরে ওঠার তাৎপর্য হলো— ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি (করার তীব্রতা) এবং পদার্থের প্রতি আসক্তি (অনুরাগ) দূর হওয়া। মানুষ যদি নিজের বিবেকের দ্বারা এই দুটিকে দূর করতে না পারে তাহলে কর্মযোগের দ্বারা সেগুলি দূর করতে হবে। কর্মযোগের দ্বারা অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অপরের জন্য কর্তব্য-কর্ম করলে কর্মের তীব্রতা (বেগ)

এবং বর্তমান অনুরাগের নিবৃত্তি হয়ে যায়। আর ফলেচ্ছা ত্যাগ করলে নতুন নতুন অনুরাগ সৃষ্টি হয় না। কর্মের তীব্রতা এবং অনুরাগ নিবৃত্ত হলে মানুষ যোগারূঢ় হয়ে যায়—

**আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।**
**যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥**
**যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।**
**সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥**

(গীতা ৬।৩-৪)

'যে যোগে আরূঢ় হতে চায়, এইরকম মননশীল যোগীর কাছে কর্তব্য-কর্ম করা হলো কারণ আর সেই যোগারূঢ় মানুষের শম (শান্তি) হলো পরমাত্ম প্রাপ্তির কারণ।' (তাৎপর্য হলো পরমাত্মপ্রাপ্তিতে কর্ম কারণ নয়, বরং কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদের ফলে যে শান্তি, সেইটিই হলো কারণ।)

'যে সময় ইন্দ্রিয়ভোগে এবং কর্মে আসক্তি থাকে না, সেইসময় সেই সকল সংকল্পের ত্যাগী মানুষকে যোগারূঢ় বলা হয়।'

তাৎপর্য হলো, কর্মের উপযোগিতা সেই পর্যন্তই, যে পর্যন্ত প্রকৃতির আধিপত্য। প্রকৃতি অতীত তত্ত্বে কর্মের সম্পূর্ণ অবিদ্যমানতা হয়ে যায় ; কেননা ক্রিয়া এবং পদার্থ সবই হলো প্রকৃতিজাত।

**প্রশ্ন**—কর্মযোগ করণসাপেক্ষ, নাকি করণনিরপেক্ষ ?

**উত্তর**—কর্মযোগ হলো করণনিরপেক্ষ অর্থাৎ তা হলো বিবেক-প্রধান সাধনা। যদি বিবেকের প্রাধান্য না থাকে তা হলে তা 'কর্ম' হবে, কর্মযোগ হবে না। 'কর্ম' হলো করণসাপেক্ষ, কিন্তু 'যোগ' করণ-নিরপেক্ষ। তাৎপর্য হলো, যোগ (সমতা)-এর প্রাপ্তি ক্রিয়ার দ্বারা হয় না, বিবেকের দ্বারা হয়। অতএব কর্মযোগ কর্ম নয়।

যোগের অপেক্ষা কর্ম দূর থেকেই নিকৃষ্ট—**'দূরেণ হ্যবরং কর্ম**

**বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'** (গীতা ২।৪৯)। যেমন পর্বতের চেয়ে অণু অনেক দূরে অর্থাৎ অণুকে পর্বতের কাছে রেখে উভয়ের তুলনা করা যায় না, তেমনই যোগ থেকে কর্ম অনেক দূরে অর্থাৎ যোগ এবং কর্মের তুলনা করা যায় না। যোগ ব্যতীত কর্ম নিরর্থক।[১]

কর্মযোগে 'আমাদের জন্য কর্ম নেই-ই' — এই বিবেকটি প্রধান থাকে। নিজের জন্য কৃত প্রতিটি কর্ম, এমনকি সমাধিও বন্ধনকারক হয়। তার কারণ হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ করা এবং না-করা দুটিই হলো কর্ম অর্থাৎ চলা, বলা, দেখা প্রভৃতির মতো বসা, মৌন থাকা, শোনা, সমাধি হওয়া প্রভৃতিও কর্ম। কর্মের সম্বন্ধ সংসারের সঙ্গে, স্বরূপের সঙ্গে নয়। স্থূল শরীরের স্থূল-সংসারের সঙ্গে একতা আছে, সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্ম-সংসারের সঙ্গে একতা আছে এবং কারণ শরীরের কারণ-সংসারের সঙ্গে একতা আছে। অতএব স্থূল শরীরের দ্বারা কৃত কর্মগুলি, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত চিন্তন এবং ধ্যান তথা কারণ শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমাধি সংসারের জন্যই, নিজের (ব্যক্তিগত) জন্য নয়। সৎ-স্বরূপে কখনও বিন্দুমাত্র কোনও ন্যূনতা আসে না। তাই তার জন্য কোনও ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকতেই পারে না। স্বরূপের উপর কিছু করার দায়িত্বও নেই অর্থাৎ তাকে নিজের জন্য কিছু করতে হবে না। যে করতে পারে তার উপরেই কিছু করার দায়িত্ব থাকে। করণ ছাড়া কোনও কর্ম করা যেতেই পারে না। করণ প্রকৃতিতে আছে আর তা প্রকৃতিরই কাজ। স্বরূপে কোনও করণ নেই। কেননা তা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সম্পূর্ণরূপে অতীত

---

[১]যোগ ব্যতীত 'কর্ম' এবং 'জ্ঞান' দুটিই নিরর্থক কিন্তু 'ভক্তি' নিরর্থক নয় ; কারণ ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। অতএব ভগবান নিজে ভক্তকে যোগ প্রদান করেন—'দদামি বুদ্ধিযোগং তম্'। (গীতা ১০।১০)

তত্ত্ব। সেজন্য স্বরূপের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। তাই কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে কেবল অপরের কল্যাণের জন্যই সকল কর্ম করেন। তাতে তিনি প্রকৃতির সম্বন্ধ (কর্মবন্ধন) থেকে মুক্ত হয়ে যান—

**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'**। (গীতা ৪।২৩)

প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে তাঁর 'করা' এবং 'না-করা'—দুটির সঙ্গেই কোনও সম্বন্ধ থাকে না—

**'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন**।' (গীতা ৩।১৮)

## গ) স্বীকৃতি পরিবর্তনের দ্বারা মুক্তি

গীতায় আছে—

**নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।**<br>**অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে॥** (২।২৪-২৫)

'এই আত্মা চিরস্থায়ী, সকলের মধ্যে পরিপূর্ণ, অচল, স্থির স্বভাব-বিশিষ্ট এবং অনাদি। একে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এ চিন্তনের বিষয় নয় এবং এর মধ্যে কোনও বিকার নেই।'

—এইরকম স্বভাববিশিষ্ট স্বয়ং (আত্মা) সদা-সর্বদা পরিবর্তনীয় নশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে,—এইটুকু স্বীকৃতিতেই চুরাশি লক্ষ যোনিতে চলে যেতে হয়—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু**।' (গীতা ১৩।২১)। কেবল পরিবর্তনশীলের সঙ্গে সম্বন্ধের স্বীকৃতিতে এতই অনর্থ হয়ে গিয়েছে যে, সে অনন্ত জন্ম ধরে অকারণেই দুঃখ পেয়ে চলেছে। এটি কত বড় আশ্চর্যের কথা ! এখন যদি সে এই মিথ্যা স্বীকৃতি ত্যাগ করে এবং প্রকৃত তত্ত্বকে স্বীকার করে নেয় তাহলে তাতে পরিশ্রম কোথায় ? এতে করণ, ক্রিয়া এবং কর্তার কী প্রয়োজন ? এতে পরিশ্রমের লেশমাত্র নেই। এতে কিছু করা সম্ভবই নয়। এতে কিছু করার তাৎপর্য হলো যেন তত্ত্ব থেকে বিমুখ হওয়া।

যা কোনও দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি,

ঘটনাদিতে আমাদের থেকে পৃথক হতে পারে না এবং আমরা যা থেকে পৃথক হতে পারি না, তাকে পেতে পরিশ্রম কোথায় ? তা আমাদের স্বাভাবিকভাবেই এবং নিত্য-নিরন্তর প্রাপ্ত। তার জন্য কিছু করতে হবে না, কিছু আনতে হবে না, কোথাও যেতে হবে। কেবল সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে—**'সঙ্কর সহজ সরূপ সম্হারা।'** এর চেয়ে সুগম আর কী হতে পারে ?

যেমন ব্রাহ্মণ সবসময় নিজের ব্রাহ্মণ্যত্বে স্থিত থাকে (নিজের ব্রাহ্মণ্যত্বকে স্মরণও করে না, ভুলেও যায় না)। তার জন্য তাকে কোনও পরিশ্রম বা অভ্যাস করতে হয় না। এইভাবেই সাধককে প্রতিমুহূর্তে নিজের অস্তিত্বে (স্বরূপে) স্থিত থাকতে হবে। তার জন্য তাঁকে কোনও অভ্যাস করতে হবে না। ব্রাহ্মণত্ব তো সাজান (স্বীকৃত) ব্যাপার, কিন্তু 'নিজত্ব' প্রথম থেকে স্বতঃসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ্যত্বতেও 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরকম অহঙ্কার থাকে, কিন্তু নিজত্বে কোনও অহঙ্কার থাকে না।

শরীর (সংসার) সর্বক্ষণ বদলাচ্ছে, বিনষ্ট হচ্ছে— এটি আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এতে আমাদের অবিনাশী চরিত্রই প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ যা নশ্বর তাকে যে অবিনাশী, সেই দেখতে পারে। পরিবর্তনশীলকে অপরিবর্তনীয়ই দেখতে পারে। অতএব নিজের অবিনাশী, অপরিবর্তনীয় স্বরূপে স্থিত হওয়ার জন্য কেউ যদি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করতে চায় তো করুক, কিন্তু বাস্তবে কিছুই করার প্রয়োজন নেই। বরং কেবল প্রয়োজন হলো সত্য তত্ত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। যখন মিথ্যা স্বীকৃতির জন্য অভ্যাস করা হয়নি তখন প্রকৃত স্বীকৃতির জন্য কেন অভ্যাস করতে হবে ? অভ্যাসের দ্বারা এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হবে, অবস্থার অতীত বোধ হবে না। তত্ত্ব অবস্থা নয়, বরং তা অবস্থার অতীত।

**জড় চেতনহি গ্রন্থি পরি গঈ। জদপি মৃষা ছূটত কঠিনঈ॥**

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।৪)

যখন মিথ্যা কথাও এত দৃঢ় হতে পারে যে তাকে ত্যাগ করতে কষ্ট হয়, তাহলে সত্য কথা দৃঢ় কেন হতে পারবে না ? সত্য কথা দৃঢ় না হওয়ার প্রধান বাধা হলো— সংসর্গজনিত সুখের প্রতি লুব্ধতা অর্থাৎ সংসারের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু এই বাধাও বাস্তবে সাধকের নিজের সৃষ্টি এবং তিনি তা দূর করতে পারেন। কারণ এই বাধাকে দূর করার শক্তি তাঁর আছে, যোগ্যতাও আছে, অধিকার, বিবেকও আছে এবং এর জন্য সংসারের, সাধু-সন্তদের এবং ভগবানের সহায়তাও প্রাপ্ত হয়েছে।

**প্রশ্ন**—সংসারের আকর্ষণ কী করে দূর হবে ?

**উত্তর**—বিবেক-বিচারপূর্বক যদি দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে সংসারের আকর্ষণ জড় (মন-বুদ্ধি-অহং)—এতেই আছে, স্বয়ং-এতে নেই। কিন্তু জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যের কারণে স্বয়ং একে নিজের বলে মেনে নিয়েছে। সংসার প্রবাহিত হয়, কিন্তু স্বয়ং অবস্থান করে। পূর্বসংস্কারবশত এরূপ মনে হয় যে স্বয়ংও ভোগে প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু বাস্তবে স্বয়ং প্রবাহিত হয় না, বরং অহং-এর কারণে তাদাত্ম্য হওয়ায় নিজের প্রবাহিত হওয়া বলে মেনে নিয়েছে। স্বয়ং-এর প্রবাহিত হওয়া ত্রিকালেও সম্ভব নয়। স্বয়ং শরীরে স্থিত হয়েও ভোগে লিপ্ত হয় না—

**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।'** (গীতা ১৩।৩১)

'সংসার যেমন নিরন্তর বিনষ্ট হচ্ছে তেমনই তার আকর্ষণও নিরন্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে বস্তু উৎপন্ন হয় তা বিনষ্ট হয়— এইটিই নিয়ম। অতএব তাকে রাখার জন্য চেষ্টা করাও ভুল এবং তাকে নাশ করার চেষ্টা করাও ভুল। তাই সাধকের উচিত ঐ আকর্ষণকে গুরুত্ব না দেওয়া, বরং তাকে উপেক্ষা করুন। উপেক্ষা করলে তা নিজে থেকেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। জলের মধ্যে মাটি মিশ্রিত থাকলে আমরা যতই হাত চাপড়ে মাটিকে নিচে রাখতে চেষ্টা করব ততই মাটি উপরে উঠে আসবে। যদি আমরা জল এবং মাটিকে একেবারেই ঘাঁটাঘাঁটি না করি তাহলে মাটি নিজে থেকেই নিচে চলে যাবে। তেমনই পরিশ্রমাদি কিছু করলে

সংসারের আকর্ষণ দূর হবে না। তাকে উপেক্ষা করে চুপ করে থাকলে তা নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে আর শুদ্ধ স্বরূপ থেকে যাবে। কেননা বিনষ্ট হওয়া হলো সংসারের স্বভাব এবং শুদ্ধ থাকা হলো স্বয়ং-এর স্বভাব—

**ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী॥**

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।২)

আমার মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে আর তা দূর হচ্ছে না— এই ভাবের ফলেই আকর্ষণ টিঁকে আছে। কারণ হলো, আমরা সবাই সত্য সংকল্প পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ এবং পরমাত্মারূপী কল্পবৃক্ষের নিচে অবস্থিত। অতএব আমরা যেমন ভাব রাখব তেমনই হয়ে যাব। তাই 'আকর্ষণ আমার মধ্যে নেই' — এই ভাব আকর্ষণকে দূর করার অব্যর্থ উপায়, কেননা এইটিই বাস্তবিক আর বাস্তবিকতাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলো সাধকের কর্তব্য।

মন-বুদ্ধি এবং সংসার (বিষয়) — দুটিই একই জাতের। এইজন্য মন-বুদ্ধির আপন জাতি অর্থাৎ সংসারের প্রতি আকর্ষণ যদি থাকে তবে তাতে নিজের সত্তার কী তফাৎ হলো ?

অতএব সাধকের উচিত তিনি মন-বুদ্ধি এবং তাতে স্থিত আকর্ষণ দুটিকেই ত্যাগ করে স্বয়ং-এ যেন স্থিত হন— **'মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ'** (ভাগবত ১১।১৩।২৬)।[১]

## ঘ) নিষেধাত্মক সাধনা

সাধনা দু'রকমের হয়—নিষেধাত্মক এবং বিধ্যাত্মক। বিবেক নিষেধ করে আর করণ (ক্রিয়া) বিধি করে। অতএব নিষেধাত্মক সাধনা

---

[১]এই বিষয়টিকে সবিস্তারে বোঝার জন্য 'গীতাপ্রেস' গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত 'সহজ সাধনা' পুস্তকের প্রথম লেখা এবং 'নিত্যযোগের প্রাপ্তি' পুস্তকের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ লেখা দুটি বিশেষ করে পড়া উচিত।

বিবেকপ্রধান অর্থাৎ 'করণনিরপেক্ষ' হয়ে থাকে আর বিধ্যাত্মক সাধনা ক্রিয়াপ্রধান অর্থাৎ 'করণসাপেক্ষ' হয়ে থাকে। বাস্তবে পরমাত্মতত্ত্ব হলো করণনিরপেক্ষ।[১] অতএব তার প্রাপ্তি নিষেধাত্মক সাধনায় তাৎক্ষণিক হয়, অন্যদিকে বিধ্যাত্মক সাধনায় তাঁর প্রাপ্তিতে দেরী হয়। যিনি নিষেধাত্মক সাধনা করেন তিনি যোগভ্রষ্টও হন না ; কেননা নিষেধাত্মক সাধনায় অসৎ, বিনাশশীলের তাৎক্ষণিক নিষেধ হয়ে যায়। কিন্তু যিনি বিধ্যাত্মক সাধনা করেন তিনি যোগভ্রষ্ট হতে পারেন ; কেননা বিধ্যাত্মক সাধনায় অসৎ-এর সাহায্য নিতে হয়। অতএব তাতে অ-সৎ (মন-বুদ্ধি-অহম্)-এর সত্তা অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে।

বিধিরূপে পরমাত্মতত্ত্বকে কখনই পাওয়া যেতে পারে না, বরং নিষেধরূপেই তাকে প্রাপ্ত করা যায়। তার কারণ পরমাত্মতত্ত্ব হলো নিত্যপ্রাপ্ত। অপ্রাপ্ত সংসারের দ্বারা স্বীকৃত সম্বন্ধ হলো নিত্যপ্রাপ্তের অনুভূতির বাধা। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অন্বেষণ হয় আর অপ্রাপ্ত সংসারের নির্মাণ হয়। অন্বেষণে নিষেধাত্মক সাধনা করা হয় আর নির্মাণে বিধ্যাত্মক সাধনা করা হয়। অতএব পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি সংসারের সম্বন্ধকে নিষেধ (ত্যাগ) করলেই হতে পারে। সবকিছুকে নিষেধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেইটিই হলো পরমাত্মতত্ত্ব। তাৎপর্য হলো, অসৎ-এর নিষেধ (ত্যাগ) করলে সৎ তত্ত্বের বিধি (সাধনা) করার দরকার হয় না। এইজন্য সাধুরা সংসারকে ত্যাগ করে

---

[১]দু'ভাবে পরমাত্মতত্ত্বের বিশেষণ দেওয়া হয়েছে — নিষেধাত্মক এবং বিধ্যাত্মক। অক্ষর, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অচল, অব্যয়, অবিনাশী প্রভৃতি বিশেষণগুলি 'নিষেধাত্মক' আর সর্বব্যাপী, কূটস্থ, ধ্রুব, সৎ, চিৎ, আনন্দ প্রভৃতি বিশেষণ হলো 'বিধ্যাত্মক'। বাস্তবিক দৃষ্টিতে পরমাত্মার বিধ্যাত্মক বিশেষণগুলির তাৎপর্যও হলো নিষেধাত্মকই, যেমন—পরমাত্মাকে 'সৎ' বলার তাৎপর্য হলো তিনি 'অ-সৎ' নন, 'সর্বব্যাপী' বলার তাৎপর্য হলো তিনি 'একদেশীয়' অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নন।

পরমাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন—

**'হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ'** (ভাগবত ১০।১৪।২৮)

কর্মের দ্বারা নয়, সন্তানের দ্বারা নয়, ধনের দ্বারাও নয়, বরং কেবল ত্যাগের দ্বারাই সাধুরা অমরত্ব লাভ করেছেন—

**'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।'**

(কৈবল্য. ১।২)

ত্যাগে তাৎক্ষণিক পরমশান্তি লাভ হয়—

**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)

পারমার্থিক উন্নতির পক্ষে ত্যাগই হলো প্রধান। হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি অসুর রাক্ষসদের মধ্যেও তো তপস্যাদি নিয়ম (বিধি) পাওয়া যায়, কিন্তু ত্যাগ (নিষেধ) পাওয়া যায় না। যাঁরা পরমাত্মপ্রাপ্তি চান কেবল তাঁদের মধ্যেই ত্যাগ পাওয়া যায়। এইজন্য নিয়ম পালন অপেক্ষা অহিংসা প্রভৃতি যম পালনকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে—

**যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।**

(ভাগবত ১১।১০।৫)

করণনিরপেক্ষ সাধনায় করণগুলির ত্যাগ (সম্বন্ধ বিচ্ছেদ) আছে। করণসাপেক্ষ সাধনাতেও অন্তিমে করণগুলিকে ত্যাগ করলে তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। করণ (জড়)-এরই ত্যাগ হয়, তত্ত্বের ত্যাগ হয় না। তার কারণ ত্যাগ তারই হয় যা স্বতঃই আমাদের ত্যাগ করে অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের একাত্মতা নেই। তাৎপর্য হলো এই যে, নিত্যপ্রাপ্তিরই প্রাপ্তি হয় আর অপ্রাপ্তের নিষেধ হয়। 'অস্তি'-রই প্রাপ্তি হয় এবং 'নাস্তি'-রই নিবৃত্তি হয়। 'অস্তি' সর্বদা স্বতঃপ্রাপ্ত, 'নাস্তি' সর্বদা স্বতঃ নিবৃত্ত।

'পরমাত্মতত্ত্ব আছে'— এই কথা মেনে নেওয়াও বাস্তবে 'সংসার নেই' এইপ্রকারে সংসারকে নিষেধ করার জন্যই হয়। অনুরূপভাবে 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এর তাৎপর্য হলো বাস্তবে

'আমি সংসারের নই আর সংসার আমার নয়'—এইভাবেই সংসারকে নিষেধ করা। ভক্তির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, অনন্য ভাবনাপূর্বক 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এইভাবে বিধিবদ্ধ স্বীকৃত সাধনাকেও ভগবান কৃপা করে সিদ্ধ করে দেন।[১] অর্থাৎ ভক্তের অনন্যভাব পূর্ণ করে দেন, অবিদ্যমানরূপ সংসারকে চিরকালের জন্য অবিদ্যমান করে দেন। তাৎপর্য হলো ভক্ত অহংকে পরিবর্তন করেন আর ভগবান তার অহংকে দূর করে দেন।[২]

নিষেধ না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধি হয় না। ভক্তিমতি মীরা বলেছেন— **'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দূসরো ন কোঈ'**। এতে **'দূসরো ন কোঈ'** হলো নিষেধ। এই নিষেধ দ্বারা এতদূর সিদ্ধি হয়েছিল যে তাঁর শরীর চিন্ময় হয়ে ভগবানের বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ জড়তার নিবৃত্তি হওয়ার পর শেষ অবশিষ্ট চিন্ময়তাই থাকে। **'মেরে তো গিরিধর গোপাল'** এমন কথা অনেকেই তো মানেন, কিন্তু তাতে ভগবানের প্রাপ্তি হয় না। যদি এর সঙ্গে **'দূসরো ন কোঈ'** এমন ভাবনা না থাকে তাহলে এটি সংসারের অন্যান্য অনেক সম্বন্ধের মতোই ভগবানের সঙ্গেও একটি সম্বন্ধ হয়ে যাবে। 'আমার কেউ নেই'— এইভাবে সম্পূর্ণত নিষেধ যদি হয়ে যায়, তাহলে বোধ জাগ্রত হবে। বোধ জাগ্রত হলেই নিত্যপ্রাপ্তির প্রাপ্তি হয়ে যাবে। তার কারণ

---

[১]অন্যকে নিষেধ করার উদ্দেশ্য হলেই 'অনন্যভাব' হয়। অতএব 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার'—এই বিধিতে (অনন্যভাব হওয়ার দরুণ) অন্যকে নিষেধ করাই প্রধান হয়।

[২]তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (গীতা ১০।১১)

'সেই ভক্তদের প্রতি কৃপা করার জন্যই তাঁদের স্বরূপ (অস্তিত্ব)-এ অবস্থানকারী আমি তাঁদের অজ্ঞানবশত অন্ধকারকে দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেই।'

যতক্ষণ অন্য সত্তার স্বীকৃতি থাকে ততক্ষণ বিবেকও থাকে। অন্য সত্তার স্বীকৃতি না থাকলে সেটিই হলো তত্ত্ববোধ।

'যোগ' নিষেধের দ্বারাই হয়—

**'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।'**(গীতা ৬।২৩)

'যাতে দুঃখের সংযোগের বিচ্ছেদ, (সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ থাকে) তাকেই যোগ নামে জানা চাই।'

কিন্তু **'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (গীতা ২।৪৮) 'সমতাকে যোগ বলা হয়' — এই বিধিও আছে। যারা সংসারের সত্তাকে মেনে নেয় তারা সংসারের মধ্যে বৈষম্য দেখে। সেইজন্য তাদের দৃষ্টিকে বৈষম্যমূলক সংসার থেকে সরিয়ে সমরূপ পরমাত্মার দিকে নিয়ে আনার জন্য **'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** বলা হয়েছে। বিধিতে করণ সঙ্গে থাকে, তাই সমতাতে অন্তঃকরণের স্থিতি বলা হয়েছে— **'যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'** (গীতা ৫।১৯)।

বিধিতে 'আমিত্ব' সঙ্গে থাকায় সাধনা সিদ্ধ হতে দেরি হয়। যেমন, 'আমি ব্রহ্ম' এটি হলো বিধি। এই অহংগ্রহ হলো উপাসনা, বোধ নয়। কেননা আমিত্বে ব্রহ্ম নেই, এবং ব্রহ্মে আমিত্ব নেই। অতএব আমিত্ব হলো কেবল কল্পনা। ব্রহ্মের আছে অনুভূতি আর সংসারের আছে প্রতীতি ; কিন্তু আমিত্বের অনুভূতি নেই, প্রতীতিও নেই, আসলে এটি হলো শুধুমাত্র অজ্ঞানীর স্বীকৃতি—**'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)।

কেবল প্রকৃতি আর প্রকৃতির কাজই হলো প্রকাশ্য এবং পরমাত্মা প্রকাশক। প্রকাশ্য এবং প্রকাশক— এই দুটিতে আমিত্ব নেই। তাহলে আমিত্ব কোথায় ? তাৎপর্য হলো আমিত্ব কেবল কল্পিত বস্তু। যদি আমিত্বকে নিষেধ করে দেওয়া যায় তাহলে তখনই সিদ্ধিলাভ হয়—**'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (গীতা ২।৭১)।

বিধি অপেক্ষা নিষেধ শ্রেষ্ঠ এবং বলবান। কিন্তু যাদের ভিতর উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব থাকে তাদের কাছে নিষেধকে মুখ্য বলে মনে হয় না, বরং এই বিধিই মুখ্য বলে দৃষ্ট হয় যে অমুক লোকটি এত টাকা দান করেছে, এত তীর্থ দর্শন করেছে, এত ব্রত উপবাস করেছে ইত্যাদি। এইজন্য তারা বিধিকে গ্রহণ করে বটে কিন্তু নিষেধকে সরিয়ে দেয়। তাদের মনে এই ভাবনাই থাকে যে, বিধি পালন করলেই উন্নতি হবে। বাস্তবে নিষেধের যত প্রয়োজন, বিধির প্রয়োজন ততটা নয়। বিধি পালনে ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু নিষেধ করলে বিধি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায় এবং তাতে কোনও ত্রুটি থাকে না। যেমন, সত্য কথা বলা হলো বিধি আর মিথ্যা না বলা হলো নিষেধ। যে সত্য কথা বলে সে কখনও মিথ্যা বলতেও পারে। কিন্তু যে মিথ্যা বলে না সে হয় সত্য কথা বলবে, নয়তো চুপ করে থাকবে। সত্য কথা বলার গুরুত্ব চোখে পড়ে কিন্তু মিথ্যা না বলার মধ্যে ততটা গুরুত্ব চোখে পড়ে না। তাই সত্য কথা বললে 'আমি সত্যবাদী' এমন অহঙ্কার আসতে পারে। কিন্তু মিথ্যা না বললে অহঙ্কার আসতেই পারে না। শুধু তাই নয়, মৌন অপেক্ষাও মিথ্যা না বলা শ্রেষ্ঠ। কেননা মৌনাবলম্বনকারী যখন কিছু বলবে তখন সে মিথ্যাও বলতে পারে। কিন্তু যে মিথ্যাবাদী নয় সে যখনই কিছু বলবে সত্য কথাই বলবে। তাৎপর্য হলো, বিধিতে অর্থাৎ নিজের উদ্যোগে কৃত সাধনায় অহঙ্কার যেমনকার তেমনই বজায় থাকে, কেননা উদ্যোগ অহঙ্কারপূর্বকই হয়ে থাকে। কর্তা (যে করে) থাকলে তবেই উদ্যোগ হবে। যদিও নিষেধেও অহঙ্কার (যে নিষেধ করে) থাকে, তবু সাধকের মধ্যে অহঙ্কারকে ত্যাগ করার উদ্দেশ্য থাকায় তা বন্ধনকারী হয় না। যার সাধনা বিবেকপ্রধান তার মধ্যে নিষেধের অহঙ্কার টিঁকে থাকতে পারে না।

ভাল করা হলো বিধ্যাত্মক সাধনা আর মন্দ ত্যাগ করা হলো নিষেধাত্মক সাধনা। ভাল করলে কোথাও না কোথাও মন্দ থেকে যেতে পারে, কিন্তু মন্দ না করলে ভাল সম্পূর্ণরূপে এসে যায়। কারণ ভালত্ব

হলো অসীম। যত ভালই করুন না কেন, কিছু ভাল বাকি থাকবেই। ভাল করলে ভালত্ব শেষ হয় না, কিন্তু মন্দ না করলে মন্দত্বের অবসান হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো, ভাল করলে ভালত্ব বাকি থাকে, কিন্তু মন্দ না করলে ভালত্ব বাকি থাকে না।

'করা' হলো সীমিত এবং 'না-করা' অসীম। অতএব ভাল করলে সীমিত ভাল হয় আর মন্দ না করলে অসীম ভাল হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো, ভালত্ব স্বতঃসিদ্ধ এবং মন্দত্ব আগন্তুক। কিন্তু যখন আমরা মন্দত্বকে স্বীকার করে নিয়ে ভাল করি অর্থাৎ ভালত্বকে কৃত্তিসাধ্য মেনে নিই তখন আমাদের দ্বারা পূর্ণ ভাল হয় না। মন্দত্বকে স্বীকার না করলে নিজে নিজেই ভাল হতে থাকে, করতে হয় না। নিজে থেকেই হয়ে যাওয়া সাধনা প্রকৃত সাধনা। আর যে সাধনা করা হয় তা নকল এবং তার সঙ্গে অহঙ্কার থাকে। যদি আমরা মন্দত্বকে ত্যাগ করে দিই, তাহলে ভাল না করলেও আমরা নিজে থেকে ভাল মানুষ হয়ে যাব।

যদি আমরা মন্দত্বকে ত্যাগ করে দিই অর্থাৎ কারও মন্দ যদি না করি, কারও সম্পর্কে খারাপ চিন্তা না করি, কারও খারাপ না দেখি, কারও সম্পর্কে খারাপ কথা না শুনি, কারও খারাপ নিয়ে আলোচনা না করি এবং স্বরূপত কাউকে বিন্দুমাত্র খারাপ না মনে করি, তাহলে এমন করার ফলে দুটি জিনিস হবে— আমরা হয় কিছু করব না আর নয়তো করলে ভালই করব। কিছু করলে তবেই তো দোষ হয়। আমরা যদি কিছু না করি তাহলে দোষ কি করে হবে ? কেননা কিছু না করলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না এবং স্বতঃসিদ্ধ নির্দোষ স্বরূপে স্বতঃস্থিতি হয়ে যায়। এজন্য ভাল করার চেয়ে খারাপ না করাই শ্রেয়।

**তন কর মন কর বচন কর, দেত ন কাহূ দুঃখ।**
**তুলসী পাতক হরত হৈ, দেখত উনকা মুখ॥**

অর্থাৎ তুলসীদাস বাবাজী বলেন যে কায়মনোবাক্যের দ্বারা কাউকে দুঃখ-কষ্ট দেয় না, তাঁর মুখ দেখলেই পাপ দূর হয়ে যায়।

মূলত আমাদের অ-সৎকেই ত্যাগ করতে হবে, সৎকে প্রাপ্ত

করতে হবে না। কেননা সৎ স্বতঃসিদ্ধভাবেই প্রাপ্ত। অ-সৎকে ত্যাগ করার পর সৎ-ই অবশিষ্ট থাকে, অ-সৎ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব অ-সৎকে ত্যাগ করলে সৎকর্ম, সৎচর্চা, সৎ চিন্তন এবং সৎসঙ্গ স্বতঃই হয়ে যাবে, করতে হবে না।

সৎ থেকে কেউ আলাদা হতেই পারে না এবং অ-সতের সঙ্গে কেউ থাকতেই পারে না। কিন্তু যখন আমরা সৎকে লাভ করতে উদ্যোগ করি তখন অ-সৎ (ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি)-এর সাহায্য নিতে হয়। কারণ অ-সতের সাহায্য ছাড়া উদ্যোগ হতেই পারে না। অ-সতের সহায়তা থাকলে সীমিত সাধনা হয়। যেমন হাত দিয়ে প্রাচীরকে মুঠোর মধ্যে নিতে পারেন না, তেমনই সীমিত সাধনার দ্বারা অসীম তত্ত্বকে ধরা যায় না। অ-সৎকে ত্যাগ (অস্বীকার) করলেই সৎ-এর প্রাপ্তি স্বতঃ হয়ে যায়। তার কারণ সৎ স্বতঃপ্রাপ্ত। তাকেই ত্যাগ করা হয় যা চিরকাল ত্যক্ত আর প্রাপ্তি তারই হয় যা চিরকাল প্রাপ্ত — **'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। সাধকের কেবল এইটুকুই কাজ যে ; তিনি বিবেকপূর্বক অ-সতের সঙ্গ যেন না করেন, অসৎকে যেন স্বীকার না করেন।

## ঙ) অহং-মমত্বের নিষেধ

করণনিরপেক্ষ সাধনায় সৎ-অসৎ বিবেকের প্রাধান্য থাকায় অহং-এর বিনাশ তাড়াতাড়ি এবং সহজে হয়ে যায়, কেননা অহংও অ-সৎ (জড়)। গীতা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহং—এই আটটিকে অপরা (জড়) প্রকৃতি বলেছেন।[১] এরকম বলার

---

[১]ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। (গীতা ৭।৪)

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহং—এই আটটিতে এক জাতীয় ঐক্য তো আছে, কিন্তু স্বরূপের সঙ্গে ঐক্য নেই অর্থাৎ জাতি এক হলেও এদের স্বরূপ ভিন্ন (এক যখন অনেকের অনুগামী হয় তখন তাকে জাতি বলে)।

তাৎপর্য হলো এই যে, যেমন ক্ষিতি হলো জড় এবং তাকে জানা যায় তেমনই অহং হলো জড় এবং তাকে জানা যায়। অতএব গীতা অহংকে 'এই' (স্বয়ং থেকে আলাদা) বলে অভিহিত করেছেন। যেমন **'এতৎ যো বেত্তি'** (গীতা ১৩।১)। **'ইদম্'** (এই) কখনও **'অহং'** (আমি) হয় না ; অতএব অহংকে 'এই' বলে অভিহিত করার তাৎপর্য হলো যে, এটি নিজের স্বরূপ নয়। কিন্তু যখন চৈতন্য (জীব) এই অহং-এর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ জুড়ে নেয় তখন সে বাঁধা পড়ে।

অহং-এর সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে পরিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় আর পরিচ্ছিন্নতা থেকে সম্পূর্ণ বিভেদ সৃষ্টি হয়। বিভেদগুলির মধ্যে আমি-আমিত্বই প্রধান। একেই অহংত্ব এবং মমত্ব নাম দেওয়া হয়েছে। আমি-আমিত্বের ভেদ আট রকমের—আমি এবং আমার, তুমি এবং তোমার, এটি এবং এর, ঐটি এবং ওর। আমি, তুমি, এটি, ওটি— এই চারটি হলো অহংত্বের রূপ। আর আমার, তোমার, এর, ওর— এই চারটি হলো মমত্বের রূপ।

আমি, তুমি, এ, ও— এই চারটিই একে অপরের দৃষ্টিতে চার হয়ে যেতে পারে। যেমন, রাম, শ্যাম, গোবিন্দ এবং গোপাল, এরা চারজন লোক। রাম এবং শ্যাম দুজনে মুখোমুখি। গোবিন্দ কাছাকাছি এবং গোপাল তাদের থেকে দূরে রয়েছে। রাম নিজেকে 'আমি' বলছে, নিজের সামনে থাকা শ্যামকে 'তুমি' বলছে, পাশ্ববর্তী গোবিন্দকে 'এ'

---

কিন্তু সত্তায় স্বরূপের ঐক্য থাকে। অতএব সত্তা তো এক, কিন্তু করণ এক নয়। সত্তায় বিভেদ সম্ভব নয় আর করণে একতা সম্ভব নয়। কোনও কোনও দার্শনিক সত্তায় (জীব তথা ঈশ্বরের) বিভেদ মানেন, আর কেউ মানেন না। যেমন যতক্ষণ না মানুষের সাযুজ্য মুক্তি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বৈষ্ণবেরা দার্শনিক তত্ত্বে বিভেদ মানেন। দার্শনিকদের মধ্যে এই মতভেদও ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ সূক্ষ্ম অহং থাকে। অহং না থাকলে সব দার্শনিক এক হয়ে যান। অর্থাৎ অহং দূর হয়ে গেলে দার্শনিক থাকেন না, বরং দর্শন (তত্ত্ব) থাকে।

বলছে এবং দূরবর্তী গোপালকে 'ও' বলছে। যদি শ্যাম নিজেকে 'আমি' বলে তাহলে সে রামকে 'তুমি' গোবিন্দকে 'এ' আর গোপালকে 'ও' বলবে। যদি গোবিন্দ নিজেকে 'আমি' বলে তাহলে সে শ্যামকে 'এ' বলবে আর রামকে 'তুমি' বলবে অথবা শ্যামকে 'তুমি' বলবে এবং রামকে 'এ' বলবে আর গোপালকে 'ও' বলবে। যদি গোপাল নিজেকে 'আমি' বলে তাহলে সে রাম, শ্যাম এবং গোবিন্দ তিনজনকে 'ও' বলবে। এইভাবে রাম, শ্যাম, গোবিন্দ এবং গোপাল— এই চারজনই একে অপরের দৃষ্টিতে আমি, তুমি, এ এবং ও হয়ে যেতে পারে। এই চার জনের মধ্যেই 'আমি' সবচেয়ে দুর্বল। কেননা একজন লোককে লক্ষ লক্ষ লোক তুমি, এ এবং ও বলতে পারে কিন্তু 'আমি' ঐ একটি লোকই বলতে পারে।

আমি-আমার হলো মায়া, যাকে ত্যাগ করার উপর সকলেই জোর দিয়েছে।[১] কিন্তু স্বরূপ মায়ারহিত। স্বরূপত 'আমি' এবং 'আমার' দুটিই নেই। সেটি 'আমি' এবং 'আমার' দুটিরই প্রকাশক, আশ্রয়, আধার এবং অধিষ্ঠান। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বিবেকের দ্বারা আমি এবং

---

[১]ক। মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া। জেহিঁ বস কীন্হে জীব নিকায়া॥

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৩।১৫।২)

খ। মৈঁ মেরে কী জেবরী, গল বঁধ্যো সংসার।
দাস কবীরা ক্যোঁ বঁধে, জাকে রাম অধার॥

গীতাতেও ভগবান তিনটি যোগেই অহংত্ব-মমত্বকে ত্যাগ করার কথা বলেছেন ; যেমন, কর্মযোগে 'নির্মমো নিরহঙ্কার স শান্তিমধিগচ্ছতি' (২।৭১), জ্ঞানযোগে 'অহঙ্কারং........বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' (১৮।৫৩) এবং ভক্তিযোগে 'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ........যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ' (১২।১৩-১৪)। কর্মযোগে নির্মম নিরহঙ্কার হলে পরমশান্তি লাভ হয়, জ্ঞানযোগে নির্মম-নিরহঙ্কার হলে ব্রহ্মে স্থিতি হয়ে যায় আর ভক্তিযোগে নির্মম নিরহঙ্কার হলে পরমপ্রেম প্রাপ্ত হয়।

আমার-কে ত্যাগ করে তার প্রকাশক, আধার, অধিষ্ঠানে স্থিত হওয়া (যা আগে থেকেই রয়েছে) হলো করণনিরপেক্ষ সাধনা।

## চ) কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের নিষেধ

ক্রিয়াগুলি কেবল প্রকৃতিতেই হয়ে থাকে। প্রকৃতি নিরন্তর ক্রিয়াশীল। তা যে কোনও অবস্থাতেই (সর্গ-প্রলয়, মহাসর্গ-মহাপ্রলয়ে) ক্ষণিকের জন্য অক্রিয় থাকে না। প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াগুলিকে ভগবান গীতায় অনেকভাবে জানিয়েছেন। যেমন—সকল ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয় (১৩।২৯) ; সকল ক্রিয়া গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাই গুণগুলি গুণের মধ্যেই সক্রিয় (৩।২৭-২৮ ; ১৪।২৩) ; গুণ ব্যতীত অন্য কোনও কর্তাই নেই (১৪।১৯) ; ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই সক্রিয় (৫।৯) ; স্বভাবই সক্রিয় (৫।১৪) ; সকল কর্মের সিদ্ধির পাঁচটি হেতু—অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব (১৮।১৩-১৪)। এইভাবে ক্রিয়াগুলিকে প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে বলতে পারেন অথবা প্রকৃতির কাজ গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে বলতে পারেন, কিংবা বলতে পারেন যে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই হচ্ছে। বাস্তবে এগুলি একই কথা। একই কথাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বলার তাৎপর্য হলো এই যে, স্বয়ং (চৈতন্য) কোনও ক্রিয়ারই সামান্যমাত্রও কর্তা নয়। প্রকৃতি যেমন কখনও অক্রিয় থাকে না তেমনই স্বয়ং-এ কখনই ক্রিয়া হতে পারে না। কিন্তু যখন স্বয়ং প্রকৃতির অংশ অহং-এর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেয় অর্থাৎ অহং-কে নিজের স্বরূপ মনে করে তখন সে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরে সংঘটিত ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে নিজেকে মানতে শুরু করে—**'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। যেমন কোনও মানুষ চলন্ত রেলগাড়িতে বসে থাকলে, নিজে না চললেও রেলগাড়ির সম্বন্ধে নিজেকেও চলমান মেনে নেয় এবং বলে যে 'আমি চলেছি'। তেমনই স্বয়ং যখন ক্রিয়াশীল প্রকৃতির

সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেয় তখন সে কর্তা না হয়েও নিজেকে কর্তা মনে করে। নিজেকে কর্তা মেনে নিলে সে প্রকৃতির যে ক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে সম্বন্ধ যুক্ত করে সেই ক্রিয়া তার কাছে ফলজনক 'কর্ম' হয়ে যায়। কর্মে বন্ধন হয়—**'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ'** (সন্ন্যাসোপনিষদ্ ২।৯৮, মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৪১।৭)।

কাজ করা এবং কাজ না-করা দুটিই প্রকৃতির অন্তর্গত। সুতরাং প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকায় চলা, বলা, দেখা, শোনা প্রভৃতির মতো বসা, দাঁড়ান, মৌন থাকা, ঘুমান, মূর্ছিত হওয়া, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করা, ধ্যান করা, সমাধিস্থ হওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিও 'কর্ম'-ই। এইজন্য ভগবান শরীর, বাণী এবং মন-এর দ্বারা কৃত সব কাজকেই 'কর্ম' বলেছেন—**'শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।'** (গীতা ১৮।১৫) আর শরীর, বাণী এবং মনের শুদ্ধির জন্য শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক তপস্যার বর্ণনা করেছেন (১৭।১৪-১৬)। এইভাবে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত যে সকল যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে এবং বেদেও যে যজ্ঞের বর্ণনা আছে সেই সবগুলিকে কর্মজনিত মানা হয়েছে—**'কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্'** (৪।৩২)।

ভগবান জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকেও কর্মেন্দ্রিয় বলে মান্য করেছেন। এইজন্য গীতায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণনা তো আছে কিন্তু কোথাও 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' শব্দটি নেই। দেখা, শোন, স্পর্শ করা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকেও গীতায় কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্মিলিত করা হয়েছে।[১] তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোকেও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে

---

[১]নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ (গীতা ৫।৮-৯)

'তত্ত্বজ্ঞ সাংখ্যযোগী দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ নেয়, খায়, চলে, গ্রহণ

কর্মেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত মানা হয়েছে। কেননা জ্ঞানেন্দ্রিয় ছাড়া মিথ্যাচারও সিদ্ধ হবে না এবং কর্মযোগের অনুষ্ঠানও হবে না।[১] যেখানে কর্মের তিনটি (সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক) ভেদের কথা বলা হয়েছে সেখানেও 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' শব্দটি নেই (গীতা ১৮।২৩-২৫)। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির জন্যও **'পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ'** (গীতা ১৩।৫) পদটি দেওয়া হয়েছে।

কর্ম তিন প্রকারের হয়ে থাকে— ক্রিয়মান, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ (ভাগ্য)। মানুষ বর্তমানে যে কর্ম করে সেগুলি হলো 'ক্রিয়মান' কর্ম। আগে (এই জন্মে অথবা আগের অনেক মনুষ্যজন্মে) কৃত যে কর্মগুলি অন্তঃকরণে সংগৃহীত রয়েছে সেগুলি হলো 'সঞ্চিত' কর্ম। সঞ্চিত কর্মগুলির মধ্য থেকে যে কর্ম ফল দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছে অর্থাৎ জন্ম, পরমায়ু এবং অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি রূপে পরিণত হওয়ার জন্য সামনে এসে গিয়েছে সেগুলি হলো 'ভাগ্য' অথবা প্রারব্ধ।

---

করে, বলে, ত্যাগ করে, ঘুমায়, শ্বাস নেয়, চোখ খোলে এবং বন্ধ করে—এইসব করেও ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে সক্রিয় রয়েছে, এমন মনে করে আমি (স্বয়ং) কিছুই করি না' এটি স্বীকার করে।

এখানে দেখা, শোন, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া এবং খাওয়া—এই পাঁচটি ক্রিয়া হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়ের। চলা, গ্রহণ করা, বলা এবং মল-মূত্র ত্যাগ করা— এই চারটি ক্রিয়া কর্মেন্দ্রিয়ের। ঘুমান—এটি হলো অন্তঃকরণের ক্রিয়া। শ্বাস নেওয়া—এটি হলো প্রাণের ক্রিয়া। চোখ খোলা এবং বন্ধ করা— এই দুটি ক্রিয়া উপপ্রাণের। তাৎপর্য হলো স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরে হওয়া ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিতে হয়, স্বয়ং-এ হয় না। অতএব কোনও ক্রিয়ার সঙ্গেই স্বয়ং-এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

[১]কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌।
ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ (গীতা ৫।৮-৯)

ক্রিয়মান কর্ম অনেক প্রকারের বলা হয়েছে। যেমন—ব্যাকরণের দৃষ্টিতে কর্ম চার প্রকারের — উৎপাদ্য, বিকার্য, সংস্কার্য (মলাপকর্ষ তথা গুণাধান) এবং আপ্য (কোথাও কোথাও নির্বর্ত্য, বিকার্য এবং প্রাপ্য—এই তিনপ্রকার বলা হয়েছে)। ন্যায়ের দৃষ্টিতে কর্ম পাঁচ প্রকারের – উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। ধর্মের দৃষ্টিতেও কর্ম পাঁচ প্রকারের—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, প্রায়শ্চিত্য এবং আবশ্যক কর্তব্য-কর্ম। এইসব রকমের কর্মও প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে সম্পন্ন হয়। প্রকৃতি হতে সম্বন্ধরহিত স্বয়ং (স্বরূপ) কখনও কোনও কর্মের সামান্যতম কর্তাও হয় না। স্বরূপকে যারা কর্তা বলে মানে ভগবান তাদের এই বলে নিন্দা করেছেন যে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধ অর্থাৎ বিবেকবতী নয়। তারা দুর্মতি।[১] কিন্তু যাঁরা অহংকে নিজেদের স্বরূপ বলে মানেন না, সেইরকম তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা স্বয়ংকে কর্তা বলে অনুভব করেন না—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** (গীতা ৫।৮)। তাৎপর্য হলো, অহংকে নিজের স্বরূপ মেনে নিলে যে **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা'** হয়ে গিয়েছিল, সেই নিজেকে অহং থেকে পৃথক অনুভব করায় **'তত্ত্ববিৎ'** হয়ে যায়।

অহঙ্কারের দ্বারা মোহিত হয়ে স্বয়ং ভুল করে নিজেকে কর্তা মেনে নিলে সে কর্ম ও তার ফলের দ্বারা বাঁধা পড়ে এবং চুরাশি লক্ষ যোনিতে পতিত হয়। এখন যদি সে নিজেকে অহং থেকে পৃথক মেনে নেয় এবং নিজেকে কর্তা মনে না করে অর্থাৎ বাস্তবে স্বয়ং যেমন, তেমনই অনুভব করে নেয় ; তাহলে তার তত্ত্ববিৎ (মুক্ত) হতে আশ্চর্যের কী আছে ? তাৎপর্য হলো, যা অসত্য তাকেও যখন সত্য মনে করায় সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তাহলে যা প্রকৃতই সত্য তাকে সত্য বলে মেনে নিলে

---

[১]তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।। (গীতা ১৮।১৬)

সেইরকমই প্রতিভাত হবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে ?

বাস্তবে স্বয়ং যে সময়ে নিজেকে কর্তা-ভোক্তা বলে মনে করে, সেইসময়ও সে কর্তা-ভোক্তা নয়—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। কারণ হলো, নিজের স্বরূপ হলো কেবলই সত্তা। সত্তাতে অহং নেই আর অহং-এর সত্তা নেই। সুতরাং 'আমি কর্তা' এই মান্যতা যত দৃঢ়ই হোক না কেন তা ভুলই। ভুলকে ভুল বলে মেনে নিলেই ভুল দূর হয়ে যায়—এইটিই হলো নিয়ম। কোনও গুহায় যদি শত শত বৎসরের অন্ধকার থাকে, আলো ফেলামাত্র তা দূর হয়ে যায়। তা দূর হতে অনেক মাস-বছর লাগে না। তাই সাধক যেন দৃঢ়তার সঙ্গে এটি যেন মেনে নেন যে, 'আমি কর্তা নই'।[১] তারপর এই মান্যতা কেবল মান্যতারূপেই থাকবে না, তা অনুভূতিতে পরিণত হয়ে যাবে।

চেতনের মধ্যে যখন কর্তৃত্বই নেই, তখন তাকে সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু কেন বলা হয়েছে—**'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'** (গীতা ১৩।২০)। এর উত্তরে ভগবান বলেছেন যে অহং-এর সঙ্গে তাদাত্ম্য করলেই চৈতন্য সুখ-দুংখের ভোক্তা হয়ে যায়—

**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।'**

(গীতা ১৩।২১)

চৈতন্যকে ভোক্তৃত্বের হেতু বলার কারণ হলো এই যে, চেতনই সুখী-দুঃখী হতে পারে, জড় বস্তু নয়। এতেও একটি মার্মিক কথা আছে।

---

[১]জড়-চেতনের গ্রন্থিতে 'আমি'-র প্রয়োগ জড় (তাদাত্মস্বরূপ অহং)-এর জন্যও হয় আবার চেতন (স্বরূপ)-এর জন্যও হয়। যেমন, 'আমি কর্তা'—এখানে জড়ের প্রতি দৃষ্টি রয়েছে আর 'আর আমি কর্তা নই' এতে (জড়ের নিষেধ থাকায়) চেতনের দিকে দৃষ্টি থাকে। যার দৃষ্টি জড়ের দিকে অর্থাৎ যে অহং-কে নিজের স্বরূপ মনে করে সে হলো 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা' আর যার দৃষ্টি চেতন (অহংরহিত স্বরূপ)-এর দিকে সে হলো 'তত্ত্ববিৎ'।

তা হলো অহং-এর সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়া সত্ত্বেও চেতন প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখের ভোক্তা নয়—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। তাৎপর্য হলো, অহং-ই কর্তা-ভোক্তা ; স্বয়ং (চেতন) নয়।

তাদাত্ম্য কী ? একটি চার-কোণাবিশিষ্ট লোহাকে যদি আগুনে গরম করা হয় তাহলে লোহা এবং আগুনের মধ্যে তাদাত্ম্য হয়ে যাবে। তাদাত্ম্য হয়ে গেলে লোহার মধ্যে জ্বালাবার শক্তি না থাকলেও সেটি জ্বালাতে পারে এবং আগুন চার-কোণাবিশিষ্ট না হলেও তা তাই হয়ে যায়। এইভাবেই জড় (অহং) এবং চেতনের তাদাত্ম্য হলে জড়ের সত্তা না থাকলেও তাতে সত্তা দৃষ্ট হয় এবং কর্তা-ভোক্তা না হলেও চেতন কর্তা-ভোক্তা হয়ে যায়।

যেমন, চুম্বকের দিকে লোহাই আকৃষ্ট হয়, আগুন হয় না। কিন্তু লোহার সঙ্গে তাদাত্ম্য হয়ে গেলে আগুনও চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে বলে প্রতীত হয়। তেমনই ভোগের দিকে অহং-ই আকৃষ্ট হয়, চেতন হয় না। অহং ছাড়া কেবল চেতন ভোগের দিকে আকৃষ্ট হতেই পারে না। অহং-এর সঙ্গে এক হয়ে গেলে স্বয়ং ভোক্তা হয়ে যায় অর্থাৎ নিজেকে সুখী-দুঃখী মনে করে। অতএব বাস্তবে অহংই কর্তা-ভোক্তা হয়, চেতন হয় না।

'আমি আছি'— এটি হলো জড়-চেতনের তাদাত্ম্য। এই 'আমি আছি'-এর মধ্যেই ভোক্তৃত্ব থাকে। 'আমি' যদি না থাকে তাহলে 'আছি' থাকবে না, 'আছে' থাকবে। যেমন— লোহা এবং আগুনের মধ্যে তাদাত্ম্য না থাকলে লোহা পৃথিবীতে থাকে আর আগুন নিরাকার অগ্নি-তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। তেমনই অহংতো প্রকৃতিতেই থেকে যায় আর 'আছি' ('আছে'র স্বরূপ হওয়ায়) 'আছে'-তেই বিলীন হয়ে যায়। 'আছে'-তে ভোক্তৃত্ব নেই। তাৎপর্য হলো, ভোগেতে 'আছি' আকৃষ্ট হয়, 'আছে' আকৃষ্ট হয় না। 'আছি'-ই কর্তা-ভোক্তা হয়,

'আছে' কর্তা-ভোক্তা হয় না। অতএব 'আছি'-কে না মেনে 'আছে'-কেই মানুন অর্থাৎ তাকে অনুভব করুন।

সুখ-দুঃখের আসা-যাওয়ার এবং স্বয়ং-এর থেকে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। সবচেয়ে বড় পাপীরও এমন অভিজ্ঞতা হয়। এমন অভিজ্ঞতা থাকলেও মানুষ আগন্তুক সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখ-দুঃখী হয়ে যায়। এর কারণ হলো, 'আমি এবং সুখ-দুঃখ—দুটিই ভিন্ন', এই বিবেককে সে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, গুরুত্ব দেয় না, এতে অবস্থান করে না। বাস্তবে স্বয়ং সুখী-দুঃখী হয় না, অহং এর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেকে সুখী-দুঃখী মনে করে। তাৎপর্য হলো, সুখ-দুঃখ কেবল মান্যতার উপরেই টিঁকে থাকে।

সুখ-দুঃখের আসা, থাকা এবং চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়ে থাকে। বাস্তবে এই তিনটি ভিন্ন নয়, এই তিনটি একই। কারণ, সুখ-দুঃখ আসামাত্র তা যেতে শুরু করে ; তার অবস্থান সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য হলো সুখ-দুঃখ নিরন্তর প্রবাহিত। তা অবিদ্যমানতার দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু অজ্ঞানবশত আমরা তাকে ধরে রেখেছি অর্থাৎ তাকে আগত এবং বিগত বলে মেনে নিয়েছি। বাস্তবে 'তা প্রবাহিত হচ্ছে' এমন বলাও সুখ-দুঃখের সত্তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়ে থাকে। যদি তাকে সত্তা না দেন, তাহলে তা থাকে না। যা নেই-ই, তা প্রবাহিত হবে কী করে ?

## ছ) স্বতঃপ্রাপ্ত ও সহজ নিবৃত্তি

স্বতঃপ্রাপ্ত কখনও অপ্রাপ্ত হয় না এবং সহজ নিবৃত্তির কখনও বিনাশ হয় না। স্বতঃপ্রাপ্ত হলো তত্ত্ব আর সহজ নিবৃত্তি হলো প্রকৃতি। সহজ নিবৃত্তির দুটি প্রকার—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিতেও সহজ নিবৃত্তি আছে এবং নিবৃত্তির মধ্যেও সহজ নিবৃত্তি আছে। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে, সহজ নিবৃত্তির আভাস প্রবৃত্তির সময় হয় না, বরং প্রবৃত্তির আদি ও অন্তে হয়ে থাকে। তাৎপর্য হলো প্রকৃতি

নিরন্তর ক্রিয়াশীল হওয়ায় কখনও অক্রিয় থাকে না। অতএব প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতাও স্থূল দৃষ্টিতে সর্গ ও প্রলয়, মহাসর্গ ও মহাপ্রলয়—এই দুটি অবস্থার রূপে প্রতীত হয়।[১] কিন্তু স্বতঃপ্রাপ্ত তত্ত্বে ক্রিয়া নেই। তাই তাতে ক্রিয়ার সহজ নিবৃত্তি আছে।

যাতে ক্রিয়া নেই তা নিত্যপ্রাপ্ত আর যাতে ক্রিয়া আছে তাকে কেউ কখনও পায়নি, প্রাপ্ত নয়, প্রাপ্ত হবে না এবং প্রাপ্ত হতে পারে না। তাৎপর্য হলো, ক্রিয়াশীল প্রকৃতির প্রতীতি তো হয়, কিন্তু প্রাপ্তি হয় না। সহজ নিবৃত্তির প্রাপ্তি কি করে হতে পারে ? অবিবেকের কারণে স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, শ্রেষ্ঠত্ব আদি প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে এগুলি অপ্রাপ্ত। তার কারণ এগুলি আগেও অপ্রাপ্ত ছিল, পরেও অপ্রাপ্ত থেকে যাবে আর বর্তমানেও এগুলি আমাদের থেকে নিরন্তর বিযুক্তই হয়ে যাচ্ছে। অতএব এগুলির নিরন্তর নিবৃত্তি (সম্বন্ধ বিচ্ছেদ) রয়েছে, প্রাপ্তি নেই।

তত্ত্বের প্রাপ্তিও স্বতঃসিদ্ধ আর প্রকৃতির নিবৃত্তিও স্বতঃসিদ্ধ। তত্ত্বের প্রাপ্তির নাম হলো 'যোগ'—'**সমত্বং যোগ উচ্চতে**' (গীতা ২।৪৮)। আর প্রকৃতির নিবৃত্তির নামও যোগ—'**দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্**' (গীতা ৬।২৩)।

—এইভাবে বিবেককে প্রাধান্য দিয়ে, নিজের বিবেক-শক্তির ব্যবহার

---

[১]সর্গের আরম্ভ থেকে সর্গের মধ্য পর্যন্ত প্রকৃতি সর্গের দিকে চলে আর সর্গের মধ্য থেকে প্রকৃতি প্রলয়ের দিকে চলে। তেমনই প্রলয়ের আরম্ভ থেকে মধ্য পর্যন্ত প্রকৃতি প্রলয়ের দিকে চলে আর প্রলয়ের মধ্য থেকে প্রকৃতি সর্গের দিকে চলে। যেমন, সূর্যোদয় হলে রৌদ্র মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বাড়তে থাকে, মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রৌদ্র কমতে থাকে। সূর্যাস্ত হয়ে গেলে, অন্ধকার মধ্য রাত্রি পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং মধ্যরাত্রি থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, অন্ধকার কমতে থাকে। তাৎপর্য হলো রৌদ্র এবং অন্ধকারের ক্রিয়া যেমন নিরন্তর চলতে থাকে তেমনই প্রকৃতির সর্গ এবং প্রলয়, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়ের ক্রিয়া নিরন্তর হতে থাকে ; কখনও বন্ধ হয় না।

করে সহজ নিবৃত্তির নিবৃত্তি আর স্বতঃপ্রাপ্তির প্রাপ্তি স্বীকার করা হলো করণনিরপেক্ষ সাধনা।

## জ) সংসারের অবিদ্যমানতা এবং পরমাত্মতত্ত্বের বিদ্যমানতা

দেখা, শোনা এবং চিন্তনের মাধ্যমে সংসারের যা কিছু দৃশ্য হোক না কেন, আগে তা অবিদ্যমানই ছিল, পরেও অবিদ্যমান হয়ে যাবে আর বর্তমানেও নিরন্তর অবিদ্যমানের দিকেই চলে যাচ্ছে—

**দেখিঅ সুনিঅ গুনিয় মন মাহীঁ। মোহ মূল পরমারথু নাহীঁ॥**

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ২।৯২।৮)

এর পরিবর্তন এত তীব্রতার সঙ্গে হচ্ছে যে, একে দ্বিতীয়বার দেখা যায় না অর্থাৎ প্রথমবার দেখলে এ যেমন ছিল দ্বিতীয়বার দেখার সময় এ তেমন থাকে না। এ কেবলই বদলাতে থাকে। পুঞ্জিকৃত পরিবর্তনের নামই হলো সংসার।

বস্তুর উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিনাশের ক্রম (পরিবর্তন) শুরু হয়ে যায়। যেমন, মাটিতে বীজ ফেললে প্রথমে মাটি ও জলের সংযোগে বীজ বিকশিত হয়। ক্রমশঃ সেটি একটু স্ফীত হয়ে খোসা নরম হতে থাকে। তারপর সেটি যখন ছিন্ন হয়, তখন তা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। অঙ্কুর থেকে দুটি পাতা বার হয়। তারপর সেটি বড় হয়ে চারা বার হয়। চারা বড় হতে হতে গাছ হয়ে যায়। আবার গাছও ধীরে ধীরে পুরানো হয়ে গিয়ে শেষে পড়ে যায়। তাৎপর্য হলো, বীজের বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত তার মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন হয়েছে। তেমনভাবেই স্ত্রী গর্ভধারণ যখন করে, তখন গর্ভে প্রথমে একটি পিণ্ড সৃষ্টি হয়। তারপর তার বৃদ্ধিতে তার মধ্যে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মতো একটি মাথা, দুটি হাত এবং দুটি পা বার হয়। তারপর চোখ, কান, নাক প্রভৃতি নটি ছিদ্র তৈরি হয়। তারপর হৃদয় প্রভৃতির নির্মাণ হয়ে, নবম মাসে তা সম্পূর্ণ অঙ্গযুক্ত হয়ে গর্ভাশয় থেকে বাইরে আসে (জন্ম নেয়)।

জন্মের পর সে প্রতিমুহূর্তে বড় হতে থাকে। জন্মের পর দু'বছর পর্যন্ত তার শিশু অবস্থা থাকে। দু'বছর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তার 'কুমার' অবস্থা। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত 'পৌগণ্ড' অবস্থা। দশ থেকে পনের বছর পর্যন্ত 'কিশোর' অবস্থা। পনের থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত তার 'যুবা' অবস্থা বলা হয়। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত 'প্রৌঢ়' অবস্থা হয়। আর পঞ্চাশ বছরের পর তার 'বৃদ্ধ' অবস্থা হয়ে থাকে।[১] তারপর তার মৃত্যু হয়ে যায়। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর এবং কারণ শরীর— এই দুটিকে নিয়ে জীব পরলোকগমন করে আর স্থূল শরীর এখানে পড়ে থাকে। সেই স্থূল শরীরে অনেক রকম বিকার (ফোলা, পচা প্রভৃতি) হতে থাকে। তাকে পোড়ালে ছাই হয়ে যায়, পশু-পক্ষী খেলে তা বিষ্ঠা হয়ে যায় আর মাটিতে পুঁতলে তা ক্রিমি হয়ে যায়।

তাৎপর্য হলো এই যে, গর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরীরে নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকে। উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিনাশের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সেইজন্য জন্ম হওয়ার পর বালক বড় হবে কি, হবে না ; পড়াশোনা করবে কি, করবে না ; ব্যবসাদি কাজ করবে কিনা ; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হবে কিনা, বিবাহ করবে কিনা, তার সন্তানাদি হবে কিনা এই সমস্ত বিষয়ে সন্দেহ থাকে। কিন্তু সে মারা যাবে কি যাবে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না ; কেননা তার নিরন্তর মৃত্যু হচ্ছে।

এইভাবে সমগ্র সংসারে শুধুমাত্র পরিবর্তনই পরিবর্তন। এমন কোনও বর্ষ নেই যখন পরিবর্তন হয় না। এমন কোনও মাস নেই যখন

---

[১]মেয়েদের অবস্থা হলো জন্ম থেকে দু'বছর পর্যন্ত 'বালিকা'। দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত 'কুমারী'। পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত 'কন্যা' (এর মধ্যেও অষ্টম বছরে 'গৌরী' এবং নবম বছরে 'রোহিণী'), দশ থেকে পনের বছর পর্যন্ত 'কিশোরী' বা 'মুগ্ধা', পনের থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত 'যুবতী', ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত 'প্রৌঢ়া' এবং পঞ্চাশের পরে 'বৃদ্ধা'।

পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হয় না এমন কোনও দিন নেই। এমন কোনও ঘণ্টা, মিনিট, এবং সেকেণ্ড নেই যখন পরিবর্তন হয় না। যেমন নদী নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে : মুহূর্তের জন্যও থেমে যায় না, তেমনই সংসারের বিনাশের প্রবাহও নিরন্তর বহমান থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকে না।

বাস্তবে সংসারের প্রবাহ নদীর এবং বিদ্যুতের প্রবাহের চেয়েও বেশি তীব্র। নদীর প্রবাহিত স্রোত এবং বিদ্যুতের গতিও এই প্রবাহেরই অন্তর্গত ! নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এক সাধু বলেছিলেন যে, নদী যেমন প্রবাহিত হচ্ছে, পুলের উপর মানুষও তেমনইভাবেই বাহিত হচ্ছে। অপর একজন সাধু তখন জানালেন যে, শুধু মানুষ নয়, পুলটিও বাহিত হচ্ছে। কেমন করে ? যেদিন এই পুলটি নির্মিত হয়েছিল, সেদিন এটি যতটা নতুন ছিল, আজ ততটা নতুন নেই। আজ যেমন রয়েছে আগামী দিনে তেমনও থাকবে না। বস্তুত পুরাতন হয়ে গিয়ে এটি একদিন ভেঙে পড়বে। তাৎপর্য হলো এই যে, এটিতে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে ; এটি নিরন্তর অবিদ্যমানতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যেকটি দেশ (স্থান) আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং এখনও নিরন্তর না-থাকার দিকে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি বছর, মাস, পক্ষ, বার, তিথি, নক্ষত্র, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড প্রভৃতি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিটি বস্তুই পরিবর্তনের স্তূপ। প্রত্যেকটি ব্যক্তি জন্মের আগে ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকবে না আর মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। জাগৃতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধি-অবস্থা তথা কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থাদি সকল অবস্থা প্রতিমুহূর্তে অবিদ্যমান হয়ে যাচ্ছে। এক সময় যে অবস্থা ছিল পর মুহূর্তেই সেই অবস্থা থাকবে না। অনুকূল, প্রতিকূল এবং মিশ্রিত (সুখ-দুঃখ যুক্ত) কোনও অবস্থাই নিরন্তর থাকে না। সকল পরিস্থিতি সর্বক্ষণ নাস্তি হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক সুখদায়ী ও দুঃখদায়ক ঘটনা

নিরন্তর অবিদ্যমান হয়ে যাচ্ছে। জন্ম-মৃত্যু, সংযোগ-বিয়োগ কোনও ঘটনাই টেঁকে না। কোনও ক্রিয়াই চিরকাল থাকে না। প্রত্যেক ক্রিয়ার আদি এবং এবং অন্ত আছে। তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা এবং ক্রিয়ার নিরন্তর পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তনকে যে জানে তা হলো অপরিবর্তনশীল তত্ত্ব। কারণ যে পরিবর্তিত হয়, সে পরিবর্তনশীলকে জানতে পারে না ; যার পরিবর্তন হয় না, সেই পরিবর্তনশীলকে জানতে পারে। গীতাতে আছে—

**ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।** (গীতা ৮।১৯)

'এই সেই প্রাণীসমুদায় বারবার সৃষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায়।'

—যা বারংবার সৃষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায় সেটি হলো পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল সংসার আর যা যেমনকার তেমন থেকে যায় সেটি হলো অপরিবর্তনশীল অখণ্ড সত্তা। সংসারে কেবল পরিবর্তনই আছে আর সত্তা অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তনীয়ের নাম সংসার আর অপরিবর্তনশীলের নাম পরমাত্মতত্ত্ব। পরমাত্মতত্ত্বের সত্তার দ্বারাই এই সংসার সত্তাবিশিষ্ট (অস্তি-রূপে) দৃষ্ট হয়—

**জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া॥**

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ১।১১৭।৮)

যেমন, আমরা বলি 'এটি মানুষ, এটি পশু, এটি গাছ, এটি বাড়ি' প্রভৃতি ; তো এতে 'মানুষ, পশু, গাছ, বাড়ি' প্রথমে ছিল না, পরেও থাকবে না আর বর্তমানেও তা অনুক্ষণ অবিদ্যমানতার দিকে চলে যাচ্ছে ; কিন্তু 'অস্তি' রূপে যে সত্তা আছে, তা সর্বদা যেমনকার, তেমনই আছে। তাৎপর্য হলো 'মানুষ, পশু, গাছ, বাড়ি' প্রভৃতি হলো সংসার আর 'অস্তি' হলো পরমাত্মতত্ত্ব। সংসারের সত্তা নেই আর পরমাত্মতত্ত্ব অবিদ্যমান নয়—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবে নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহং — এই আটটি হলো অপরা প্রকৃতি (গীতা ৭।৪)। এই আটটিতে ক্রিয়া, পরিবর্তন এবং বিকৃতি হয়, কিন্তু এইগুলি যার সত্তায় সত্তাবান বলে প্রতীত হয় সেই 'অস্তি'-তে কখনও বিন্দুমাত্র কোনও ক্রিয়া, পরিবর্তন, বিকৃতি হয় না। তা চিরকাল যেমনকার তেমনই থাকে। যেমন, আমরা বলে থাকি যে, 'পৃথ্বী আছে'। এতে তো দুটি শব্দ রয়েছে 'পৃথ্বী' এবং 'আছে'। যখন ভূমিকম্প হয় তখন তা হয় পৃথ্বীতে, 'আছে'-তে হয় না। গাছপালা মাটিতে—পৃথ্বীতে (ক্ষিতিতে) জন্মায় ; 'আছে'-তে জন্মায় না। জল কখনও জমে বরফ হয়, কখনও বা বাষ্প হয়ে উঠে যায় কিন্তু 'আছে' জন্মেও না, ওঠেও না। জল ঠাণ্ডা বা গরম হয়, 'আছে' তা হয় না। আগুন কখনও জ্বলে, কখনও শান্ত থাকে কিন্তু 'আছে' কখনও জ্বলেও না, শান্তও হয় না। বায়ু কখনও স্থির থাকে, কখনও প্রবাহিত হয় কিন্তু 'আছে' স্থিরও থাকে না, প্রবাহিতও হয় না। মেঘ আকাশকে আচ্ছাদিত করে, 'আছে'-কে করে না। শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ আগুনের, রস জলের এবং গন্ধ মাটির গুণ, কিন্তু 'আছে'-তে এই গুণগুলি নেই। মন-ই স্থির অথবা চঞ্চল হয়, 'আছে' হয় না। সঙ্কল্প-বিকল্প মনে হয়, 'আছে'-তে হয় না। কখনও ঠিক বুঝতে পারা, কখনও কম বুঝতে পারা আবার কখনও একেবারেই বুঝতে না পারা বুদ্ধিতে হয়, 'আছে'-তে হয় না। সমস্ত ক্রিয়া অহং (ধাতুরূপ সমষ্টি অহংকার)-এ হয়, 'আছে'-তে কখনও বিন্দুমাত্র কোনও ক্রিয়া হয় না। এই অহং-এর সঙ্গেই সম্বন্ধ যুক্ত করে জীব মনে করে 'আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি মূর্খ, আমি বিদ্বান, আমি উচ্চ, আমি নীচ' ইত্যাদি। কিন্তু 'আছে' কখনও সুখী-দুঃখী, কর্তা-ভোক্তা, মূর্খ-বিদ্বান, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি হয় না।

আমরা বলি 'সংসার আছে' অর্থাৎ পরিবর্তন সংসারেই হয়, 'আছে'-তে হয় না। যেমন, 'কাঠ আছে' অর্থাৎ বিকৃতি কাঠেই হয়,

'আছে'-তে হয় না। কাঠ পোড়ে, 'আছে' পোড়ে না। কাঠ পুড়ে কাঠ-কয়লা হলে যে কাঠ আগে ছিল সেইটিই কয়লা হলো, 'আছে'-তে তো কোনও পরিবর্তন হলো না। এইভাবেই কাঠকে কাটা হয়, 'আছে' কে কাটা হয় না। জলে কাঠ ভেসে যায়, 'আছে' ভাসে না। কাঠ কখনও ভিজে, কখনও শুকনো হয়, 'আছে' কখনও তা হয় না, কাঠ কখনও এক অবস্থায় থাকে না আর 'আছে'-র কখনও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয় না।

যা বদলায় সেটি হলো সংসার আর যা কখনও বদলায় না সেই 'আছে' হলো 'পরমাত্মতত্ত্ব'। সংসারের সত্তা সৃষ্টির পরেই হয়েছে, কিন্তু 'আছে' সত্তা সৃষ্টির পরে নয়, বরং সৃষ্টির আগে থেকে স্বতঃ-সিদ্ধ —'**নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ**' (গীতা ২।২০)। অতএব সংসারের সত্তা অবাস্তব (মেনে নেওয়ামাত্র) এবং একদেশীয় আর 'আছে'-র সত্তা বাস্তবিক এবং অনন্ত।

সংসারের 'আছে'-র প্রয়োজন আছে, কিন্তু 'আছে'-র সংসারের প্রয়োজনীয়তা নেই। তার কারণ সংসারের সত্তা 'আছে'-র অধীন, কিন্তু 'আছে'-র সত্তা সংসারের অধীন নয়। যেমন, আলোতে সবকিছু দেখা যায়, তবে সর্বপ্রথম আলোকেই দেখা যায়, বস্তুগুলি পরে দেখা যায়। তেমনই সর্বপ্রথম 'আছে' দৃষ্ট হয়, সংসার পরে। কিন্তু ভোগ এবং সংগ্রহে আসক্ত মানুষ কেবল সংসারকেই দেখে— '**কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ**' (গীতা ১৬।১১), আর তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ সংসারকে না দেখে কেবল 'আছে'-কেই দেখে —'**বাসুদেবঃ সর্বম্**' (গীতা ৭।১৯)

### ঝ) একদেশীয় সত্তা এবং অনন্ত সত্তা

সাধকের সমস্যা হলো এই যে যার সত্তা নেই, যা একমুহূর্তও স্থির থাকে না, সেই সংসারের (ভোগের) আকর্ষণ তো অনুভব করে, কিন্তু

যার সত্তা আছে, যা সদা-সর্বদা বর্তমান সেই তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ হয় না। যা 'নাস্তি' তার প্রভাব পড়ে আর যা 'অস্তি' তার প্রভাব পড়ে না। এখন এ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বাস্তবে 'নাস্তি'কে 'অস্তি' বলে মেনে নিলেই ভোগ হয়। সংসারকে স্থায়ী মনে না করলে সংসারকে ভোগ করা যায় না। বাস্তবে সংসারের কোনও স্থিতি নেই। প্রতিমুহূর্তে তার বিনাশ হচ্ছে, বিনাশের এই ক্রম (প্রবাহ)-কেই স্থিতি বলা হয়। কিন্তু ভোগ করার সময় এই বোধটি মনে থাকে না। সুখভোগের ইচ্ছাই এই বোধকে তিরস্কৃত (বাতিল) করে দেয় অর্থাৎ সুখভোগের ইচ্ছা ভোগকে সত্তা দিয়ে দেয়। তাই ভোগের কোনও সত্তা একেবারেই নেই, এটি দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে গেলে সুখভোগের ইচ্ছা দূর হয়ে যায় ; অথবা একমাত্র পরমাত্মতত্ত্বেরই সত্তা আছে এটি দৃঢ়-নিশ্চয় হয়ে গেলে সুখভোগের ইচ্ছা দূর হয়ে যাবে।

'নাস্তি' ক্রমাগত 'নাস্তি'-র দিকেই যায় আর 'অস্তি' সর্বদা 'অস্তি'-তেই থাকে। নিত্যনিবৃত্তির নিরন্তর নিবৃত্তি হচ্ছে আর নিত্যপ্রাপ্তির নিরন্তর প্রাপ্তি হচ্ছে। এই বাস্তবিকতাকে অনুভব করবার জন্য অহঙ্কার (একদেশীয় মনোভাব)-কে দূর করা একান্ত আবশ্যক।

নিজের মধ্যে 'আমি আছি'—এই যে একদেশীয় মনোভাব (অহং) দৃষ্ট হয় ; তা থেকেই পরিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য, ব্যক্তিত্ব, অবিদ্যমানতা, জড়তা, অশান্তি, কর্তৃত্ব, ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বিকার সৃষ্টি হয়। এই একদেশীয় মনোভাবের ফলে তত্ত্বে বিভেদ, দূরত্ব এবং বিমুখতা সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনে একদেশীয় মনোভাব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভোগে আকর্ষণ থাকে। এই একদেশীয় মনোভাব (আমিত্ব)-কে দূর করবার উপায় হলো—নিজের মধ্যে পরমাত্মতত্ত্বের সত্তা (অস্তি)-কে স্বীকার করা।

নিজের মধ্যে নিজে-থেকে ভিন্ন পরমাত্মতত্ত্বের সত্তাকে স্বীকার

করলে কি দ্বৈতভাব আসবে না ? না, দ্বৈতভাব আসবে না ; বরং দ্বৈতভাবের বিনাশ হয়ে যাবে। তার কারণ, নিজের মধ্যে যে একদেশীয় সত্তা দৃষ্ট হয় তাতে পরমাত্মতত্ত্বের অনন্ত সত্তাকে স্বীকার করলে একদেশীয় সত্তা দূর হয়ে যায়। একদেশীয় সত্তা দূর হলেই দ্বৈতভাব, পরিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিকারগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। এইসব বিকার একদেশীয় সত্ত্বার কারণেই দেখা যায়।

যে সত্তার মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সেই অনন্ত সত্তা আর একদেশীয় সত্তার মধ্যে বাস্তবে কোনও প্রভেদ নেই। ভগবান বলেছেন—

‘**ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত**।’ (গীতা ১৩।২)

‘হে ভারত ! তুমি সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানবে।’

তাৎপর্য হলো বাস্তবে সত্তা দুটি নয়, একটিই—‘**বাসুদেবঃ সর্বম্**’। অপরা প্রকৃতির যে অংশে ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়, সেই অংশ অর্থাৎ ‘অহং’-এর সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নিলেই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অহং-এর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেওয়াতেই একদেশীয় সত্তা প্রতীত হতে থাকে। এই একদেশীয় সত্তাকেই জীব, ঈশ্বরের অংশ, পরাপ্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই একদেশীয় সত্তাকেই ‘আমি আছি’— এইরূপে জানা যায়। এই একদেশীয় সত্তা যে অনন্ত সত্তার অংশ সেই অনন্ত সত্তাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান নামে অভিহিত হন। সেই অনন্ত সত্তাকেও ‘অস্তি’-রূপে জানা যায়। এইভাবে অহং-এর কারণে একই সত্তার দুটি ভেদ হয়ে যায়— একদেশীয় সত্তা (জীব) এবং অনন্ত সত্তা (ব্রহ্ম)।

‘আমি আছি’—এটি হলো জড় চেতনার গ্রন্থি। এতে ‘আমি’ হলো জড় (প্রকৃতি)-এর অংশ আর ‘আছি’ চেতন (পরমাত্মা)-এর অংশ। ‘আমি’-ত্বর প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্য রয়েছে এবং ‘আছি’-র ঐক্য রয়েছে

পরমাত্মা (অস্তি)-র সঙ্গে। 'আমি'-ত্বের কারণেই 'অস্তি' 'আছি' রূপে দৃষ্ট হয়। যদি 'আমি'ত্ব না থাকে তাহলে 'আছি' 'অস্তি'-র মধ্যে মিশে যাবে। সকল 'আছি'-ই 'অস্তি'-র মধ্যে মিশে যায়, কিন্তু 'অস্তি' 'আছি'-র মধ্যে মেশে না। বাস্তবে 'আছি' 'অস্তি'-র মধ্যে মিশে আছেই। সেই 'অস্তি'-র মধ্যে 'আমি'-ত্ব নেই। তাৎপর্য হলো 'আমি'-ত্ব (অহং)-এর ফলেই সত্তার 'আছি' এবং 'অস্তি'-র প্রভেদ সৃষ্টি হয়। এইজন্য সত্তাভেদকে দূর করতে, আমি-ত্বকে দূর করা, বিনাশ করা প্রয়োজন। এই 'আমি'-ত্বকে ভুলবশত মানা হয়ে থাকে। এই ভুল নিজের মধ্যে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছে, সত্তা (তত্ত্ব)-এর মধ্যে নেই। এই একটি ভুলের মধ্যেই অনেক ভুল সন্নিবিষ্ট। এই ভ্রমকে দূর করতে 'আছি'-কে 'অস্তি'-তে মিশিয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। 'আছি'-কে 'অস্তি'-তে মিশিয়ে দিলে 'আমি' থাকবে না, 'অস্তি' (তত্ত্ব) থেকে যাবে।

এই যে মেনে নেওয়া একদেশীয় সত্তা 'আমি আছি', এটিকে তো নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক বলেই ধরা হয় ; কিন্তু তত্ত্বের অনন্ত সত্তাকে মান্য করা হয়[১] —এই বৈপরীত্যের কারণ হলো অহঙ্কার। অহঙ্কারকে দূর করবার জন্য একদেশীয় সত্তাকে অনন্ত সত্তার মধ্যে মিশিয়ে দাও অর্থাৎ সমর্পিত করে দাও, যা হল বাস্তবিক। এমন করলে মেনে নেওয়া একদেশীয় সত্তা থাকবে না, থাকবে দেশকালাদির ভাবসমূহের অতীত

---

[১]বাস্তবে 'আমি আছি'—এই একদেশীয় সত্তা হলো আমাদের ভুল স্বীকৃতি, তা অনুভূতি নয়— 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে' (গীতা ৩।২৭)। এই মিথ্যা মান্যতার জন্য অনন্ত সত্তার (যা আগে থেকেই যেমনকার তেমনভাবে বিদ্যমান) অনুভূতি হয় না অর্থাৎ তার দিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এইজন্য 'আমি আছি' এই মিথ্যা মান্যতাকে মান্যতার দ্বারাই দূর করবার কথা গীতাতে বলা হয়েছে—'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ' (গীতা ৫।৮)

অনন্ত সত্তা। তাৎপর্য হলো অনন্ত সত্তার মান্যতা, মান্যতারূপে থাকবে না ; বরং আগে যতটা দৃঢ়তার সঙ্গে একদেশীয় সত্তার আভাস পাওয়া যেত তার চেয়েও বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে অনন্ত সত্তার অনুভূতি স্বতঃই হতে থাকবে।

একটি মার্মিক কথা হলো, অনন্ত সত্তাকে একদেশীয় সত্তার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া অপেক্ষা একদেশীয় সত্তাকে অনন্ত সত্তার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া শ্রেয়। তার কারণ, একদেশীয় সত্তার মধ্যে অনাদিকাল থেকে মেনে নেওয়া অহঙ্কারের সংস্কার থাকে। অতএব তার মধ্যে যখন অনন্ত সত্তাকে স্থাপিত করা হবে তখন সেই অহঙ্কার তাড়াতাড়ি বিদূরিত হবে না। কিন্তু একদেশীয় সত্তাকে অনন্ত সত্তার মধ্যে মিলিয়ে দিলে অহঙ্কার একেবারেই থাকবে না। তার কারণ হলো অনন্ত সত্তা স্বীকৃত নয়, তা বাস্তবিক।

বাস্তবে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ঐক্য স্থাপনা করাই হলো ভুল। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ঐক্য অদ্যাবধি হয়নি, হবে না এবং হতেও পারে না। তার কারণ জীবের মধ্যে ব্রহ্মভাব নেই এবং ব্রহ্মের মধ্যে জীবভাব নেই। অতএব জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে ঐক্য না করে জীবভাবকে অর্থাৎ অহং (আমিত্ব)-কে দূর করতে হবে। অহং দূর হলেই ব্রহ্ম থেকে যাবে। একেই গীতা **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) বলেছেন। এইজন্যই একথা বলা হয়েছে যে জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না, বরং জীবভাব দূর হলেই ব্রহ্মই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে—

**'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬)
**'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'** (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৯)
**'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ'** (গীতা ৫।২০)

ভগবান অহংকে দূর করবার পরেই ব্রাহ্মী স্থিতি হওয়ার কথা বলেছেন—

**নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥**
**এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।**

(গীতা ২।৭১-৭২)

ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার পর কখনই অহং-এর দ্বারা মোহিত (অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

তাৎপর্য হলো এই যে, বাস্তবিক সত্তা একটিই। একদেশীয়, সৃজনশীল, ব্যবহারিক এবং প্রাতিভাষিক (যা প্রতীত হয়) সত্তা বাস্তবে সত্তা নয়, তা সত্তার আভাসমাত্র অর্থাৎ তা সত্তার মতো দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাস্তবে সত্তা নয়। প্রকৃত সত্তা অনুভবযোগ্য বস্তু নয়, বরং তা অনুভবরূপ। আমরা তাকে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি (করণ)-এর দ্বারা দেখতে, অনুভব করতে চাই— এইটিই হলো আমাদের ভুল। যাকে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির দ্বারা দেখা যায় তা কি করে সৎ হবে ? যা সকলের দ্রষ্টা (প্রকাশক) তাকে কে দেখতে পারে ? অতএব যদি সেই বাস্তব সত্তাকে অনুভব করতে হয়, তাহলে সাধককে ভিতরে-বাইরে চুপ হয়ে যেতে হবে, তিনি যেন কিছুই চিন্তা না করেন।

## ঞ) শরণাগতি

যাঁর মধ্যে চিন্তা-ভাবনার প্রাধান্য নেই, শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই যাঁর মধ্যে প্রধান— এইরকম সাধককেও 'আমি সংসারের নই, সংসারও আমার নয়, বরং আমি পরমাত্মার আর পরমাত্মাই আমার' এইভাবে সংসারের প্রতি বিমুখ হয়ে পরমাত্মার সম্মুখীন হতে হবে, তাঁর শরণাগত হতে হবে।

যখন সাধক নিজেকে কোনও সাধনার যোগ্য বলে মনে করেন না অর্থাৎ নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারেন বলে মনে করেন না এবং পরমাত্মার প্রাপ্তি না হওয়ায় অধীর হয়ে পড়েন তখন তিনি শরণাগতির

অধিকারী হয়ে যান।[১] যেমন ঘুম স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, তার জন্য পরিশ্রম (অভ্যাস) করতে হয় না, তেমনই সাধক যখন সংসার থেকে হতাশ হয়ে যান এবং পরমাত্মার আশাও ছাড়তে পারেন না, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই পরমাত্মার শরণাগত হয়ে যান। শরণ নেবার জন্য তাঁকে কোনও প্রয়াস করতে হয় না। তার কারণ হলো, শরণাগত হতে কোনও করণের প্রয়োজন হয় না, কেবল ভাবের প্রয়োজন হয়। ভাব হয় স্বয়ং-এর, কোনও করণের নয়। যেমন, মেয়ের বিবাহ হলে 'এখন আমি স্বামীর' — এই ভাব উদিত হলেই তার মা-বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে যায়। স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ জোড়াতে কোন্ করণের প্রয়োজন হয় ? কোন্ অভ্যাসের দরকার হয় ? অর্থাৎ কোনও করণ বা অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। 'আমি স্বামীর' এই মান্যতা (স্বীকৃতি) স্বয়ং-এর, কোনও করণের নয়[২]। মন-বুদ্ধি প্রকৃতির অংশ আর স্বয়ং হলো পরমাত্মার অংশ। অতএব পরমাত্মার শরণাগত হতে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি কোনও কিছুরই বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন স্বয়ং-এর। স্বয়ং-ই পরমাত্মার শরণাগত হয়, মন-বুদ্ধি নয়। তাৎপর্য হলো, পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বোধ এবং ভাবের

---

[১] হৌঁ হার্‌য়ৌ করি জতন বিবিধ বিধি অতিসৈ প্রবল অজৈ।
তুলসিদাস বস হোই তবহিঁ জব প্রেরক প্রভু বরজৈ।।

(বিনয়পত্রিকা ৮৯)

[২]মন-বুদ্ধি দিয়ে যাকে মানা হয় তা বিস্মৃত হয়ে যায়, কিন্তু স্বয়ং-এর দ্বারা যা স্বীকৃত হয়, তা বিস্মৃত হয় না, তাকে স্মরণে রাখতে হয় না। যেমন আমি বিবাহিত—এই স্বীকৃতি স্বয়ং-এর দ্বারা হয় ; অতএব একে মনে না রাখলেও এ সম্পর্কে ভ্রান্তি হয় না। বিবাহে তো নতুন সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক অনাদিকাল থেকে স্বতঃই রয়েছে। যখন নতুন (পাতানো) সম্বন্ধেরও ভ্রান্তি হয় না, তখন স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধের বিস্মৃতি কি করে হতে পারে ? 'যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্' (গীতা ৪।৩৫)।

প্রয়োজন, করণের নয়। স্বয়ং-এর দ্বারা সেখানে সিদ্ধি হয়, সেক্ষেত্রে করণের অপেক্ষা থাকে না।

একটি হলো 'পর'-এর আশ্রয় (পরাশ্রয়) আছে এবং অপরটি হলো 'স্ব'-এর আশ্রয় (স্বাশ্রয়)। আটটি ভেদবিশিষ্ট অপরা প্রকৃতি (পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি শরীর এবং সংসার হলো 'পর' এবং এদের আশ্রয় হলো 'পরাশ্রয়'। ক্রিয়া এবং পদার্থের আশ্রয় হলো স্থূল-শরীরের আশ্রয়। মন, বুদ্ধির অর্থাৎ চিন্তন, মনন, ধ্যান প্রভৃতির আশ্রয় হলো সূক্ষ্ম-শরীরের আশ্রয় এবং অহঙ্কার, স্বভাব ও সমাধির আশ্রয় হলো কারণ-শরীরের আশ্রয়।

স্বরূপের আশ্রয়ও 'স্বাশ্রয়' এবং পরমাত্মার আশ্রয়ও 'স্বাশ্রয়'।[১] কারণ 'স্ব'-এর দুটি অর্থ হয়ে থাকে স্বয়ং (স্বরূপ) এবং স্বকীয়। পরমাত্মা হলেন স্বকীয়, কেননা তাঁর সঙ্গে আমাদের অখণ্ড সম্বন্ধ রয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, তিনি যে কোনও দেশ, কাল, পাত্র, ক্রিয়া, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে আমাদের থেকে আলাদা হতে পারেন না এবং আমরাও তাঁর থেকে আলাদা হতে পারি না, তিনিই 'স্বকীয়' (নিজের) হতে পারেন। যা প্রত্যেক দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু

---

[১]আশ্রয়, অবলম্বন, অধীনতা, প্রপত্তি এবং সহায়তা— এই শব্দগুলি 'শরণাগতি'-র পর্যায়, কিন্তু এগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে ; যেমন—পৃথিবীর আধার ছাড়া আমরা থাকতে পারি না, তেমনই ভগবানের আধার ছাড়াও আমরা থাকতে পারি না— এটি হলো ভগবানের 'আশ্রয়'। হাতের হাড় ভেঙে গেলে ডাক্তাররা সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেন, এইভাবে ভগবানের সাহায্য (ধরা) নেওয়ার নামই হলো 'অবলম্বন'। ভগবানকে প্রভু মেনে নিয়ে তাঁর দাস হয়ে যাওয়া হলো 'অধীনতা'। ভগবানের পায়ে পতিত হওয়া হলো 'প্রপত্তি'। জলে ডুবন্ত মানুষ কাঠ, পাথর প্রভৃতিকে আধাররূপে পায়, তেমনই সংসার সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষের ভগবানের আধার নেওয়া হলো 'সহায়তা'।

প্রভৃতিতে আমাদের থেকে নিরন্তর আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তার আশ্রয় (পরাশ্রয়) নেওয়ার কারণেই স্বকীয়ের আশ্রয় (সাশ্রয়) অনুভূত হচ্ছে না।

জীবের বন্ধনের প্রধান কারণ হলো—অহঙ্কারের আশ্রয় (পরাশ্রয়)। অহঙ্কারের আশ্রয়ই হলো উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম নেওয়ার কারণ —**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। অহঙ্কারের সঙ্গই হলো গুণের সঙ্গ ; কেননা অহঙ্কারও সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস গুণবিশিষ্ট হয়—**'বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ'** (ভাগবত ১১।২৪।৭)। অহঙ্কারের আশ্রয় নিলে জীব নিজেকে এবং অহংকে আলাদা দেখে না, বরং একই দেখে। তাই তার মধ্যে পরিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তিত্ব, পরাধীনতা, অবিদ্যমান্যতা, বন্ধন, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি দোষ এসে যায়। অহঙ্কারের আশ্রয় দূর হলেই সব দোষ নিবৃত্ত হয়। অহঙ্কারের আশ্রয় (পরাশ্রয়) দূর করার জন্য 'নিরাশ্রয়' অথবা 'স্বাশ্রয়' হওয়া প্রয়োজন।

কর্মযোগে 'নিরাশ্রয়' অর্থাৎ কর্মফলের আশ্রয় ত্যাগ করা হয়—**'অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্'** (গীতা ৬।১) ; **'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ'** (গীতা ৪।২০)। যে বস্তুরই সৃষ্টি ও বিনাশ হয়, সেই সবই হলো 'কর্মফল'। কর্মফলের আশ্রয় নিলে বারবার জন্ম-মৃত্যু হয় এবং কিছুই পাওয়া যায় না—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)। তার কারণ হলো প্রত্যেক কর্মের আদি এবং অন্ত হয়, তাহলে তা থেকে প্রাপ্তব্য ফল অবিনাশী কি করে হতে পারে ? নিরাশ্রয় হলেই স্বতঃসিদ্ধ 'স্বাশ্রয়' (স্বরূপের আশ্রয়) অনুভূত হয়ে যায়।

জ্ঞানযোগে 'স্বাশ্রয়' অর্থাৎ স্বরূপের আশ্রয় হয়ে থাকে। স্বরূপের আশ্রয়ে সাধক মুক্তি লাভ করে। কিন্তু স্বরূপের আশ্রয়ে অহঙ্কারের লেশ থাকতে পারে। কেননা এতে মুক্তির (স্বতন্ত্রতার) অভিমানকারী থেকে যায়। এইজন্য গীতা **'অহং ব্রহ্মাস্মি'** (আমি ব্রহ্ম)-এটিকে বড় মনে

করেনি, বরং **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (সবকিছুই পরমাত্মা)—এটিকে বড় মনে করেছে ; কেননা তাতে অহংকার (ব্যক্তিত্ব) একেবারেই থাকে না।

ভক্তিযোগে 'স্বাশ্রয় অর্থাৎ স্বকীয় পরমাত্মার আশ্রয় হয়ে থাকে। 'স্ব' (স্বরূপ)-এর আশ্রয় নেওয়া অপেক্ষা 'স্বকীয়'-এর আশ্রয় নেওয়া শ্রেষ্ঠ। কেননা 'স্ব'-এর আশ্রয় নিলে মানুষ মুক্তি (অখণ্ডরস) লাভ করতে পারে, কিন্তু অলৌকিক প্রেম (অনন্তরস) লাভ করতে পারে না।[১] প্রেমের প্রাপ্তি স্বকীয় পরমাত্মার আশ্রয় নিলেই হয়ে থাকে। প্রেম প্রাপ্ত হলে অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।[২]

## ট) নিশ্চুপ-সাধনা

পরমাত্মাকে লাভ করবার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা হলো — মৌন সাধনা অর্থাৎ কোনও কিছু চিন্তন না করা। এটি সর্বোপরি করণনিরপেক্ষ সাধনা। চিন্তা করলেই সংসারের সম্বন্ধ এঁটে যায়। তার কারণ চিন্তা করা, —বৃত্তি লাগাবার অর্থ হলো বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া। বিনাশশীলকে গুরুত্ব দেওয়া, তার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেওয়া, তার সাহায্য নেওয়া হলো তত্ত্বপ্রাপ্তির প্রধান বাধা। অবিনাশীর প্রাপ্তি বিনাশশীলের দ্বারা হয় না, বরং তাকে ত্যাগের দ্বারাই হয়। জড়ের দ্বারা চেতনের প্রাপ্তি কি করে হতে পারে ? অসৎ-এর দ্বারা সৎ-এর প্রাপ্তি কি করে হতে পারে ? পরিবর্তনশীলের দ্বারা অপরিবর্তনীয়ের প্রাপ্তি কি করে হতে পারে ? ক্ষণভঙ্গুরের দ্বারা সর্বতোভাবে নির্বিকার

---

[১]ভগবান তো পূতনাকেও মুক্তি দিয়েছিলেন কিন্তু যশোদাকে নিজেকেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

[২]ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা ১৮।৫৪)

তত্ত্বের প্রাপ্তি কি করে হতে পারে ? বিনাশশীল, জড়, অসৎ, পরিবর্তনশীল, ক্ষণভঙ্গুরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই তত্ত্বের স্বতঃ প্রাপ্তি হয়। এইজন্য বিনাশশীলকে গুরুত্ব দেওয়া, তার সাহায্য নেওয়ার ভাব প্রথম থেকেই সাধকের থাকা উচিত নয়। শাস্ত্রতে বলা হয়েছে— **'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'** অর্থাৎ 'দেবতা হয়ে গিয়ে দেবতার পূজা করবে।' অতএব অক্রিয় এবং অচিন্ত্য হয়ে গিয়ে অক্রিয় এবং অচিন্ত্য তত্ত্বকে প্রাপ্ত করতে হবে।

গীতায় বলা হয়েছে—

**আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।** (৬।২৫)

'পরমাত্মস্বরূপে মন (বুদ্ধি)-কে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করে আর কোন কিছুই চিন্তা (চিন্তন) করবে না।'

এর তাৎপর্য হলো এই যে ; সকল দেশ, কাল, পাত্র, ক্রিয়া, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে এক পরমাত্মতত্ত্বই 'অস্তি' (সত্তা) রূপে যেমনকার তেমনভাবেই পরিপূর্ণ আছে। দেশ, কাল প্রভৃতির তো অবিদ্যমানতা হয়, কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব সদা বর্তমান। এইভাবে সাধককে প্রথমে মন-বুদ্ধির দ্বারা এই দৃঢ়-নিশ্চয় করতে হবে, যে 'পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যমান'। পরে এই নিশ্চয়কে ত্যাগ করে দিতে হবে এবং নিশ্চুপ হয়ে যেতে হবে অর্থাৎ কোনও কিছুই চিন্তা করবেন না। সংসারের চিন্তা করবেন না, স্বরূপের বা পরমাত্মকারও চিন্তা করবেন না। কোনও কিছু চিন্তা করলে তো সংসারই এসে যাবে। কারণ কোনও কিছু চিন্তা করলে চিত্ত (করণ) সঙ্গে থাকবে। করণ সঙ্গে থাকলে সংসারের ত্যাগ হবে না। তার কারণ হলো, করণও হল সংসার। এইজন্য **'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'** (কোনও কিছু চিন্তা করবে না) — এতে করণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ আছে। কেননা যখন করণ সঙ্গে থাকবে না তখনই প্রকৃত ধ্যান হবে। সূক্ষ্মতম চিন্তন করলেও বৃত্তি থাকে, বৃত্তির অবিদ্যমানতা হয় না। কিন্তু কোনও কিছু চিন্তা করবার ভাব না থাকলে বৃত্তি স্বতঃই শান্ত হয়ে যায়। তাই সাধককে সম্পূর্ণরূপে চিন্তাকে উপেক্ষা করতে হবে।

কোনও কিছু চিন্তা না করার পরেও যদি কোনও চিন্তা নিজে থেকে এসে যায় তাহলে সাধক যেন তার প্রতি রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ না করেন, তাকে ভাল বা মন্দ বলে মনে না করে এবং তাকে নিজের মধ্যেও যেন মনে না করেন। চিন্তা করতে হবে না, কিন্তু চিন্তা যদি এসে যায় তাহলে তাতে কোনও দোষ নেই। নিজে থেকেই বায়ু বয়, গ্রীষ্ম-শীত হয়, বর্ষা হয় কিন্তু তাতে আমাদের কোনও দোষ হয় না, দোষ হয় করলে। অতএব চিন্তা যদি এসে যায় তাকে উপেক্ষা করবেন, তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবেন না, অর্থাৎ একথা মনে করবেন না যে আমার মধ্যে চিন্তা হচ্ছে এবং আমি চিন্তা করছি। চিন্তা হচ্ছে মনে এবং মনের সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই।

'চিন্তা করব না' — এমন আগ্রহও সাধকের থাকা উচিত নয়। সাধকের না তো মন একাগ্র করার আগ্রহ রাখতে হয়, না মন সরাবার আগ্রহ। মনকে স্থির রাখারও আগ্রহ রাখতে নেই, মন থেকে চঞ্চলতা দূর করবারও আগ্রহ থাকতে নেই, বিশেষ কোনও কিছুতে বৃত্তি নিয়োজিত করবার আগ্রহ রাখতে নেই আবার কোনও বৃত্তিকে অপসারিত করবারও আগ্রহ রাখতে নেই। চোখ-কান খোলা রাখারও আগ্রহ নেই, আবার বন্ধ রাখারও আগ্রহ রাখতে নেই। কোনও কিছু করার বা কোনও কিছু না করারও যেন আগ্রহ না থাকে—'**নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন**' (গীতা ৩।১৮)। এইভাবে সাধক কোনও কিছুর প্রতি আগ্রহ না রেখে উদাসীন হয়ে যাবে, নিশ্চুপ হয়ে যাবে—

**উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।**
**গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥**

(গীতা ১৪।২৩)

'যার অবস্থান উদাসীনের মতো এবং যাকে গুণের দ্বারা বিচলিত করা যায় না এবং গুণ গুণেতেই প্রবৃত্ত— এই ভাব নিয়ে যিনি নিজের স্বরূপে স্থিত থাকেন এবং স্বয়ং কোনও চেষ্টা করেন না।'

ঘুমের জন্য যেমন কোনও পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয় না, বরং

স্বাভাবিকভাবে ঘুম এসে যায়। সেইভাবেই নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার জন্য কোনও উদ্যোগ করবেন না, স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চুপ, শান্ত হয়ে যেতে হয়। সাধক দিনে কয়েকবার, কাজ করতে করতেও দু-এক সেকেন্ডের জন্যও যদি নিশ্চুপ, শান্ত হয়ে যান তাহলে তিনি নিশ্চুপ হওয়ার যুক্তিটি আয়ত্ত করতে পারবেন অর্থাৎ জড়তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ এবং স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের অনুভূতি হয়ে যাবে। তখন তিনি সব কাজ করার সময়েও নিশ্চুপ থাকতে পারবেন, এটি হল সমাধির চেয়েও উঁচু 'সহজাবস্থা'।

**উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।**
**কনিষ্ঠা শাস্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাঽধমাঽধমা।।**

এই অবস্থাটি সংস্কারপন্থীদের বোঝাবার জন্য একে 'সহজাবস্থা' বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এটি অবস্থা নয়, এটি হলো অবস্থাতীত। তার কারণ হলো অবস্থা হয় প্রকৃতিতে, তত্ত্বে নয়। বাস্তবে নিশ্চুপ-সাধনার দ্বারা সাধক সহজাবস্থা (সহজ সমাধি), তত্ত্বজ্ঞান, জীবন্মুক্তি, ভগবৎ-দর্শন প্রভৃতি যা চান, তিনি তাই পেয়ে যান। নিশ্চুপ হলে সাধক স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি শরীর থেকে সহজে অতীত হয়ে যান এবং তাঁর অহং নিজে থেকে দূর হয়ে যায়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি যে কোনও যোগমার্গেরই সাধক তিনি হন না কেন, নিশ্চুপ-সাধনা সকলের পক্ষেই খুবই উপযোগী। এই নিশ্চুপ সাধনা সকল শক্তির ভাণ্ডার ; কেননা শক্তিসমূহ অক্রিয় তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট হয় এবং তাতেই বিলীন হয়ে যান। এই সাধনায় এক বিশেষ শান্তি পাওয়া যায়, তার ফলে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদি দোষগুলি দূর করবার সামর্থ্য স্বাভাবিকভাবে এসে যায় এবং আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার কোনও প্রভাব পড়ে না। শুধু তাই নয়, যে লাভ ধর্মমেঘ সমাধিতেও হয় না, সেই লাভ নিশ্চুপ-সাধনায় হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো, নিশ্চুপ সাধনা সকল সাধনার অন্তিম সাধনা ; এর ফলে পূর্ণতা এসে যায় অর্থাৎ **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (সবকিছুই

পরমাত্মা)—এই অনুভূতি হয়ে যায়।[১]

**শঙ্কা**—করণনিরপেক্ষ সাধনার যে আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে চিন্তন-মনন করলে তবেই না নিজের বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে ! চিন্তন-মনন-মন-বুদ্ধি (করণ)-এর দ্বারাই হয়। তাহলে এটি করণনিরপেক্ষ সাধনা কি করে হবে ?

**সমাধান**—সাধনাকে 'করণনিরপেক্ষ' (বিবেকপ্রধান) বলা হয়েছে, 'করণরহিত' (ক্রিয়ারহিত) বলা হয়নি। করণনিরপেক্ষ সাধনায় যতক্ষণ পর্যন্ত সাধকের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পরিচ্ছিন্নতা থাকে, ততক্ষণ সে চিন্তন-মনন করে ; কিন্তু তার মধ্যে চিন্তন-মনন করার অর্থাৎ তত্ত্বে মন-বুদ্ধি নিযুক্ত করার প্রাধান্য থাকে না, বিবেকেরই প্রাধান্য থাকে। অচিন্ত্য তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি থাকায় তার মধ্যে বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রধান হয়। তাৎপর্য হলো, এই আলোচনার লক্ষ্য চিন্তন-মনন, ধ্যান, একাগ্রতা, সমাধি প্রভৃতির দিকে নয় বরং তা চিন্তন-মনন প্রভৃতির অতীত এবং এগুলিকে প্রকাশিতকারী যে বাস্তবিক তত্ত্ব, সেই দিকেই থাকে।

বস্তুত বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য চিন্তন-মনন অথবা অভ্যাস করবার প্রয়োজন-ই নেই, বরং ভ্রমাত্মক স্বীকৃতিকে দূর করে প্রকৃত বিষয়টির প্রতি শুধুমাত্র স্বীকৃতি করানই প্রয়োজন। অভ্যাস হয় করণের দ্বারা আর স্বীকৃতি স্বয়ং-এর দ্বারা হয়। অভ্যাসের দ্বারা কখনও তত্ত্ববোধ হয়নি, হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। তার কারণ অভ্যাসের দ্বারা একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় আর পরিচ্ছিন্নতা আরও দৃঢ় হয়ে যায়। ফলেতার দ্বারা অবস্থাতীত এবং অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব কি করে পাওয়া সম্ভব ? তাৎপর্য হলো, কেবল ভুল স্বীকৃতিকে নিষেধ করতে হবে, অভ্যাস করতে হবে না।

---

[১]নিশ্চুপ-সাধনা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানতে হলে গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত 'সহজ সাধনা' বইটি পড়ে দেখবেন।

করণসাপেক্ষ সাধনাতেও বিবেক থাকে এবং করণনিরপেক্ষ সাধনাতেও করণ থাকে। তবে করণসাপেক্ষ সাধনায় করণ (ক্রিয়া)-এর প্রাধান্য থাকে আর করণনিরপেক্ষ সাধনায় থাকে বিবেকের প্রাধান্য।

করণসাপেক্ষ সাধনার মহিমাও বিবেকের জন্যই, করণের জন্য নয়। বিবেক ছাড়া করণ অন্ধ। যদি করণের সঙ্গে বিবেক না থাকে তাহলে করণসাপেক্ষ সাধনা হবেই না। এইজন্য সাধনাকে 'করণরহিত' না বলে 'করণসাপেক্ষ' অথবা করণনিরপেক্ষ বলা হয়েছে। যদি করণসাপেক্ষ সাধনা থেকে বিবেককে বার করে দেওয়া হয়, তাহলে জড়তা এসে যাবে অর্থাৎ সাধনা হবেই না আর করণনিরপেক্ষ সাধনা থেকে যদি করণকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে চিন্ময়তা এসে যাবে অর্থাৎ বোধ উৎপন্ন হবে, সাধনা সিদ্ধ হয়ে যাবে। বিবেক ছাড়া করণ হলো জড়, পাথর এবং করণ ছাড়া বিবেক হলো বোধ। চিন্ময়তা (বোধ) প্রাপ্তিতে জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া (স্বীকৃত) সত্তাই হলো বাধক।

বিবেক হলো অর্ধেক সৎ এবং অর্ধেক অ-সৎ অর্থাৎ বিবেকে সৎ-অসৎ দুটিই আছে, কিন্তু করণ সম্পূর্ণত অসৎ। বিবেকের মধ্যে সৎ-অসৎ দুটি থাকায়, অসৎ দূর হয়ে যাবে এবং সৎ থেকে যাবে। অতএব বিবেকের মধ্যে গ্রাহ্য (সৎ) এবং ত্যাজ্য (অসৎ) দুটি অংশ থাকে, কিন্তু করণে কেবল ত্যাজ্য অ-সৎ অংশই থাকে। অতএব বিবেক বোধে পরিণত হয় এবং করণের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়— এই বিচ্ছেদ তো আগে থেকেই রয়েছে। তাৎপর্য হলো এই যে, বিবেকের মধ্যে জড়কে ত্যাগ করবার সামর্থ্য আছে, কিন্তু করণের মধ্যে জড়কে ত্যাগ করবার সামর্থ্য নেই ; কেননা করণ হলো স্বয়ং জড়।

~~○~~

## করণসাপেক্ষ এবং করণনিরপেক্ষ সাধনায় পার্থক্য

একটি হলো নির্মাণ করা আর অন্যটি হলো অন্বেষণ করা। নির্মাণ সেই জিনিসেরই হয় যা আগে ছিল না এবং যা কৃতিসাধ্য এবং অন্বেষণ সেই জিনিসেরই হয় যা আগে থেকেই স্বতঃসিদ্ধ। করণসাপেক্ষ সাধনায় অভ্যাসের দ্বারা একটি নতুন জিনিসের নির্মাণ হয় এবং করণনিরপেক্ষ সাধনায় অবস্থাতীত এবং নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্বের অন্বেষণ হয়ে থাকে— **'হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ'** (ভাগবত ১০।১৪।২৮) ; **'ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্'** (গীতা ১৫।৪)।

করণসাপেক্ষ সাধনার প্রধান কথা হলো— মন-বুদ্ধি (করণ)-কে পরমাত্মায় নিয়োজিত করলেই তাঁকে পাওয়া যায়। করণনিরপেক্ষ সাধনার প্রধান কথা হলো— করণের দ্বারা নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, বরং করণকে ত্যাগের দ্বারাই তা হয়।

করণসাপেক্ষ সাধনায় বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে ; অতএব সেখানে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, জগৎ প্রভৃতি সবকিছু হলো বুদ্ধির বিষয়। করণনিরপেক্ষ সাধনায় বিবেকের প্রাধান্য থাকে। করণের প্রয়োগে তো বিবেকের প্রয়োজন থাকে কিন্তু বিবেকের প্রয়োগে করণের কোনও প্রয়োজন থাকে না।

করণসাপেক্ষ সাধনায় করণ (বুদ্ধি) থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে বোধ এসে যায় আর করণনিরপেক্ষ সাধনায় বিবেকই বোধে পরিণত হয়ে যায় ; কারণ বিবেক হলো নিত্য এবং করণ অনিত্য।

জ্ঞানময় বৃত্তির দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মময় দেখা অর্থাৎ বৃত্তিগুলিকে নিয়ে চেতনকে দেখা হলো করণসাপেক্ষ সাধনা আর বিবেকের দ্বারা বৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপে স্থিত হওয়া হলো করণনিরপেক্ষ সাধনা। যথা, তুলসী গাছ থেকে তৈরি মালায় তুলসী কাঠের পুঁতির মধ্যে সূতাকে দেখা অর্থাৎ পুঁতিসহ ভিতরে থাকা সূতাকে প্রত্যক্ষ করা হলো করণসাপেক্ষ সাধনা ; আর প্রারম্ভেই পুঁতির মধ্যস্থিত

সূতাকে দেখে নিয়ে পুঁতিকে ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ কেবল সূতাকেই দেখা হলো করণনিরপেক্ষ সাধনা।

আমি, তুমি, এটি, ঐটি— এই চারটির মধ্যেই 'আছে' (সত্তা) সমান ; কিন্তু 'আমি'-র সঙ্গে থাকলে ঐ 'আছে' একদেশীয় 'আছি' হয়ে যায়। 'আমি'-কে নিয়ে 'আছে'-কে দেখা হলো করণসাপেক্ষ সাধনা। অতএব 'আমি ব্রহ্ম'— এটি মনে করা (বুদ্ধির দ্বারা হওয়ায়) হলো করণসাপেক্ষ আর 'আমি নেই, ব্রহ্ম আছে'— এটি মনে করা (স্বয়ং-এর দ্বারা হওয়ায়) হলো করণনিরপেক্ষ সাধনা।

রজ্জুতে সর্প দর্শন হয়— এখানে রজ্জুসহ 'অধিষ্ঠান' হলো চেতন (রজ্জু উপধিযুক্ত), আর সর্প হলো 'অধ্যস্ত' (ভ্রমাত্মক, যা রজ্জুর মধ্যে ভুলবশত দৃষ্ট হয়) এবং রজ্জুতে সর্পের দৃষ্ট হওয়া হলো 'অধ্যাস'। অধ্যস্ত অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বস্তুর দ্বারা অধিষ্ঠানের সম্পর্কে জ্ঞান আনা হলো করণসাপেক্ষ সাধনা এবং বিবেকের প্রাধান্যে অধ্যস্ত বস্তুর (সর্পের) একান্ত অ-ভাব করে অধিষ্ঠান (চেতন তত্ত্ব)-এ স্থিত হওয়া হলো করণনিরপেক্ষ সাধনা।

করণসাপেক্ষ সাধনায় অভ্যাস হলো প্রধান আর করণনিরপেক্ষ সাধনায় বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই হলো প্রধান। অভ্যাস ক্রিয়াসমন্বিত আর বিবেক হলো ক্রিয়ারহিত।

করণসাপেক্ষ সাধনায় 'ক্রিয়া' (কিছু করা)-র প্রাধান্য থাকে আর করণনিরপেক্ষ সাধনা 'ভাব' (মেনে নেওয়া) এবং 'বোধ' (জানা)-র প্রাধান্য থাকে।

করণসাপেক্ষ সাধনায় অভ্যাস প্রধান হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিক সিদ্ধি পাওয়া যায় না[১] এবং করণনিরপেক্ষ সাধনায় বিবেকের প্রতি

---

[১]তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাঽঽসেবিতো দৃঢ়ভূমি॥

(যোগদর্শন ৭।১৩-১৪)

'চিত্তের স্থিরতার জন্য প্রযত্ন করা হলো অভ্যাস। এই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর শ্রদ্ধাপূর্বক সম্পূর্ণরূপে সেবন করার পর দৃঢ় অবস্থাসম্পন্ন হয়।'

শ্রদ্ধাই প্রধান কারণ হওয়ায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তার কারণ হলো করণসাপেক্ষ সাধনায় একটি অবস্থা সৃষ্টি হয় কিন্তু করণনিরপেক্ষ সাধনায় অবস্থার সৃষ্টি হয় না, বরং অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং অবস্থাতীত স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের অনুভূতি হয়ে যায়।

করণসাপেক্ষ সাধনায় মুমুক্ষার প্রাধান্য থাকে এবং করণনিরপেক্ষ সাধনায় থাকে জিজ্ঞাসার প্রাধান্য। মুমুক্ষায় বন্ধন থেকে মুক্তির ইচ্ছা থাকে আর জিজ্ঞাসায় তত্ত্বকে জানার ইচ্ছা থাকে। অতএব মুমুক্ষায় থাকে বন্ধনের দুঃখের প্রাধান্য আর জিজ্ঞাসায় থাকে সৎ-অসতের বিবেকের প্রাধান্য।

মনকে ভগবানে নিয়োজিত করা হলো করণসাপেক্ষ সাধনা আর সংসারের সম্বন্ধকে নিষিদ্ধ করে 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার'—এইভাবে নিজে থেকেই নিজেকে ভগবানে সমর্পিত করা হলো করণনিরপেক্ষ সাধনা।

করণসাপেক্ষ সাধনায় মনকে সঙ্গে নিয়ে স্বরূপে স্থিত হতে হয়—**'যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে'** (গীতা ৬।১৮) ; অতএব মনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলে যোগভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—**'যোগাচ্চ-লিতমানসঃ'** (গীতা ৬।৩৭)। কিন্তু করণনিরপেক্ষ সাধনায় মনের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় যোগভ্রষ্ট (চঞ্চলমনা) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। করণনিরপেক্ষ সাধনায় প্রথম থেকেই মনের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ থাকে।

যেমন, শুরুতে কোনও সাধক সকাম এবং কোনও সাধক নিষ্কাম থাকে, তবে অন্তিমে সকাম সাধকের নিষ্কাম হলেই তত্ত্বের অনুভূতি হয়। তেমনই শুরুতে কেউ করণসাপেক্ষ (ক্রিয়াপ্রধান) সাধনা করতে পারে এবং কেউ করণনিরপেক্ষ (বিবেকপ্রধান) সাধনা করতে পারে কিন্তু যিনি করণসাপেক্ষ সাধনা করেন তিনি অন্তিমে করণনিরপেক্ষ হলে তবেই তত্ত্বের অনুভূতি লাভ করেন ; কারণ তত্ত্ব হলো করণরহিত।

দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, করণসাপেক্ষ সাধনায় পরাধীনতা থাকে, অহং-এর বিনাশ তাড়াতাড়ি হয় না, সাধক অন্তিমকালে যোগভ্রষ্ট হতে পারেন এবং তত্ত্বের প্রাপ্তি দেরিতে ও কষ্ট-সাধ্য হয়। কিন্তু করণনিরপেক্ষ সাধনায় স্বাতন্ত্র্য থাকে, অহং-এর বিনাশ তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, যোগভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং তাড়াতাড়ি ও সহজে তত্ত্বের প্রাপ্তি হয়ে যায়।[১]

~~○~~

[১]সঙ্কর সহজ সরূপু সম্হারা। লাগি সমাধি অখন্ড অপারা॥

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ১।৫৮।৪)

হরীরা জাণৈ সহজ কু, সহজাঁ সব কুছ হোয়।
সহজাঁ সাঁঈ পাইয়ৈ, সহজাঁ বিষিয়া খোয়॥
সহজাঁ মারগ সহজ কা, সহজ কিয়া বিশ্রাম।
হরিয়া 'জীব'র সীব কা, এক নাম অর ঠাম॥

—"বাহিরে এবং ভিতরে নীরব হয়ে যাওয়া, নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া হলো নীরব সাধনা। অন্তরে এমন চিন্তা করে নিন যে, আপনাদের কিছুই করতে হবে না। স্বার্থের জন্যও নয়, পরমার্থের জন্য নয় ; লৌকিক বা পারলৌকিক কোনও কিছুই করতে হবে না। এমন চিন্তা করে নিয়ে বসে যান। বসবার ভাল সময় হলো সকালে ঘুম থেকে উঠার সঙ্গে সঙ্গে। ঘুম থেকে ওঠার পরেই ভগবানকে নমস্কার করে বসে যান। গভীর ঘুমের সময় যেমন কিছু করবার জন্য বিন্দুমাত্র সংকল্প ছিল না তেমনি জাগ্রত অবস্থাতেও কোনও কিছু করবার সংকল্প যেন না থাকে। চিন্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি কোনও কিছুই করতে হবে না। আবার 'চিন্তন' প্রভৃতি কিছুই করতে হবে না—এমন সংকল্পও যেন না থাকে। কারণ 'না করার' সংকল্পও তো 'করা'। বাস্তবে 'না-করা' স্বতঃসিদ্ধ। মন-বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্বীকার করেই 'করা' হয়ে থাকে।

এখন বিন্দুমাত্র কিছু করতে হবে না এমন চিন্তা করে চুপ করে যান। মন, যদি মানতে না চায় তাহলে 'সর্বত্র এক পরমাত্মা পরিপূর্ণ'—একথা ভেবে নিয়ে নীরব হয়ে যান। যদি সগুণের উপাসনা করেন তাহলে 'আমি প্রভুর চরণে পড়ে আছি' একথা মেনে নিয়ে নীরব হয়ে যান। কিন্তু এটি দু-নম্বরের কথা, এক নম্বরের কথা হলো এই যে, কিছুই করতে হবে না। এইভাবে নীরব হওয়ার পর অন্তরে যদি কোনও সংকল্প-বিকল্প উদিত হয়, কোনও কথা স্মরণে আসে তাহলে তাকে উপেক্ষা করবেন, বিরোধিতা করবেন না। তাতে সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট , অনুরাগ-বিদ্বেষ করবেন না। শাস্ত্রবিহিত ভাল সংকল্প যদি আসে তবে তাতে সন্তুষ্ট হবেন না আর শাস্ত্র নিষিদ্ধ খারাপ সংকল্প যদি আসে তবে তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না। নিজেকেও সেই সংকল্পের মধ্যে জড়াবেন না অর্থাৎ সেগুলিকে নিজস্ব বলে মেনে নেবেন না।

আপনারা বলবেন, মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মন ভাল-খারাপ হয়ই না। ভাল-খারাপ কেবল স্বয়ংই হয়। স্বয়ং যদি ভাল হয় তাহলে সংকল্প ভাল হবে আর স্বয়ং যদি খারাপ হয়, তাহলে সংকল্প খারাপ হবে। ভাল-খারাপ এই দুটি প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে হয়ে থাকে। প্রকৃতির সম্বন্ধ ছাড়া ভাল-ও হয় না, খারাপ-ও হয় না ; যেমন সুখ এবং দুঃখ দুটি জিনিস, কিন্তু আনন্দে

দুটি জিনিস হয় না অর্থাৎ আনন্দে সুখও নেই, দুঃখও নেই, এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য তত্ত্বে ভালও নেই, খারাপও নেই। এইজন্য ভাল-মন্দ বিভেদ করে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হবেন না।

সংকল্প আসে কিংবা যায়, তাই আগে থেকেই ঠিক করে নিন যে, বাস্তবে সংকল্প আসে না, বরং যায়। অতীতে আমরা যে কাজ করেছি তা মনে পড়ে যায় অথবা ভবিষ্যতে যা করব বলে স্থির করেছি তা স্মরণে এসে যায়—যেমন সেখানে যেতে হবে, ঐ কাজটা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা মনে আসে, যা বর্তমানে একেবারেই নেই। প্রকৃতপক্ষে সেই স্মৃতিগুলির প্রবেশ হচ্ছে না বরং সেগুলি বেরিয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে যে কথা জমে আছে তা বেরিয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনারা তার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়বেন না, আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন। সম্বন্ধ না জুড়লে সেই সংকল্পের দোষ আপনাদের লাগবে না এবং সেই সংকল্পও নিজে নিজে নষ্ট হয়ে যাবে ; কেননা নিয়মই হলো—যা উৎপন্ন হয়, তা নষ্ট হয়ে যায়।

সংসারে অনেক পুণ্য কাজ করা হয় কিন্তু সেগুলি থেকে কি আমাদের পুণ্য হয় ? তেমনই সংসারে অনেক রকম পাপ কাজ করা হয় কিন্তু সেগুলি থেকে কি আমাদের পাপ হয় ? হয় না। কেন হয় না ? তার কারণ সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। সেগুলিতে আমাদের কোনও দায় নেই। সংসারে যেমন পাপ-পুণ্য হয়ে থাকে তেমনই মনে সংকল্প-বিকল্প হয়ে থাকে। আমরা সেগুলি করি না, করতে চাইও না। আমরা যদি সেগুলির সঙ্গে জুড়ে যাই তাহলে সেগুলি পুণ্য এবং পাপ, ভাল এবং মন্দ রূপে পরিগণিত হয়। তাতে তাদের ফল সৃষ্টি হয় এবং সেই ফলভোগ আমাদের করতে হয়। এইজন্য সেগুলির সঙ্গে জড়াবেন না ; সেগুলিকে অনুমোদন করবেন না এবং সেগুলির বিরোধিতাও করবেন না। সংকল্প-বিকল্প যদি আসে তো আসুক। এটি করতে হবে এবং এটি করতে হবে না—এই দুটিকে ছেড়ে দিন। গীতায় বলা হয়েছে—

**নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।** (৩।১৮)

করা এবং না-করা দুটির প্রতিই আগ্রহ রাখবেন না। করার আগ্রহও হলো

সংকল্প এবং না-করার আগ্রহও হলো সংকল্প। করাও কর্ম এবং না-করাও কর্ম। করাতেও পরিশ্রম এবং না-করাতেও পরিশ্রম। অতএব করা এবং না-করা দুটির প্রতি কোনওরকম গুরুত্ব না দিয়ে নীরব হয়ে গেলে প্রকৃতির সম্বন্ধ দূর হয়ে যায় এবং স্বতঃই পরম-বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় ; কেননা ক্রিয়ারূপে প্রকৃতিই বিদ্যমান। সেই ক্রিয়া প্রকৃতির হোক, মনেরই হোক, — সবই প্রকৃতির। এইভাবে ভিতরে-বাহিরে নীরব হয়ে গেলে, যাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা হয়, জীবন্মুক্তি বলা হয়, সহজ সমাধি বলা হয় তা স্বতঃই অনুভূত হয়।

**উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।**
**কনিষ্ঠা শাস্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাঽধমাঽধমা॥**

—খুবই ছোট সাধনা হলো তীর্থযাত্রা। তার চেয়ে বড় হলো শাস্ত্রচিন্তন। শাস্ত্রচিন্তনের চেয়েও বড় হলো ধ্যান-ধারণা, এবং সর্বোচ্চ হলো সহজাবস্থা (সহজ সমাধি)[১]— এই সহজাবস্থায় আপনারা পৌঁছিয়ে যাবেন।”

~~O~~

[১]প্রবৃত্তি (করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা)—দুটিই হলো প্রকৃতির রাজ্যে। নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত সবই প্রকৃতির রাজ্যে, কেননা নির্বিকল্প সমাধি থেকেও ব্যুত্থান হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ক্রিয়া প্রকৃতিতে হয় আর ক্রিয়া ছাড়া ব্যুত্থান হওয়া সম্ভবই নয়। এজন্য চলা, বলা, দেখা, শোনা প্রভৃতির মতো দাঁড়ানো, নীরবতা, নিদ্রা, মূর্ছা এবং সমাধিস্থ হওয়াও হলো ক্রিয়া। তাৎপর্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধিও কর্ম। এতে সমাধি এবং ব্যুত্থান দুটি অবস্থাই হয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলে কোনও অবস্থা থাকে না, বরং ‘সহজ সমাধি’ অথবা ‘সহজাবস্থা’ হয়ে থাকে, তার থেকে কখনও ব্যুত্থান হয় না।

সহজাবস্থা বাস্তবে অবস্থা নয়, বরং তা অবস্থার অতীত। অবস্থাতীত কোনও অবস্থা নয়। অবস্থাভেদ আছে প্রকৃতিতে, স্বরূপে নেই। এইজন্যই সহজাবস্থাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত লেখাটি **‘সহজ সাধনা’** পুস্তকের অন্তর্গত ‘নীরব সাধনা’ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

॥ শ্রীহরি ॥

# গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**

**লেখক**—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 **শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)**

(৪) 1744 **শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৫) 1574 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)**

(৬) 1660 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৭) 1662 **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

(৮) 556 **গীতা-দর্পণ**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**

অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**

মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 **গীতা প্রবোধনি** (লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

(১২) 1393 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৩) 1444 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(১৪) 395 গীতা-মাধুর্য

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

**(১৫) 1851 গীতা রসামৃত**

**(১৬) 1901 সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য**

**(১৭) 1937 শিবপুরাণ**

**(১৮) 1455 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (লঘু আকারে)

**(১৯) 1883 শ্রীরামচরিতমানস (তুলসীদাসী রামায়ণ)**

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পূর্ণ নূতনরূপে অনুচিত।

**(২০) 275 মানুষ কর্ম করায় স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?**

**লেখক**—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

**(২১) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**

**লেখক**—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

**(২২) 1469 সর্বসাধনার সারকথা**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

**(২৩) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**

**লেখক**—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

**(২৪) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

**(২৫) 1102 অমৃত-বিন্দু**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

**(২৬) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

**(২৭) 1925 ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব**

**(২৮) 1936 ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস**

কোড নং

(২৯) 1358 **কর্ম রহস্য**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(৩০) 1122 **মুক্তিলাভের জন্য গুরুকরণ কি অপরিহার্য ?**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(৩১) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

**লেখক**—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(৩২) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(৩৩) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূলসহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(৩৪) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩৫) 1603 **উপনিষদ্**

(৩৬) 1604 **পাতঞ্জলযোগ**

(৩৭) 903 **সহজ সাধনা**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

সাধন পথের সহজতম দিক্-দর্শন।

(৩৮) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

**লেখক**—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৯) 1415 **অমৃত-বাণী**

**লেখক**—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪০) 1541 **সাধনার দুটি প্রধান সূত্র**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

(৪১) 1478 **মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ**

**লেখক**—স্বামী রামসুখদাস

বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

কোড নং

(৪২) 1651 **হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!**

স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৪৩) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪৪) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন

(৪৫) 1489 গীতা দিনলিপি ( **Available within Nov. to Jan.** )

(৪৬) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

(৪৭) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা

(৪৮) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৪৯) 1884 ঈশ্বর লাভের বিবিধ উপায়

(৫০) 1303 সাধকদের প্রতি

(৫১) 1579 সাধনার মনোভূমি

(৫২) 1978 ঈশ্বরের পাঁচটি নিবাসস্থল

(৫৩) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

(৫৪) 1581 গীতার সারাৎসার

(৫৫) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৫৬) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৫৭) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৫৮) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৫৯) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৬০) স্তুতি

(৬১) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৬২) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি

(৬৩) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং সদ্‌গুরু কে ?

(৬৪) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৬৫) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৬৬) 469 মূর্তিপূজা

(৬৭) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান

(৬৮) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

(৬৯) 1742 শরণাগতি

(৭০) 762 গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন

(৭১) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়

(৭২) 1043 নবদুর্গা

(৭৩) 1096 কানাই

| | কোড নং | |
|---|---|---|
| (৭৪) | 1097 | গোপাল |
| (৭৫) | 1098 | মোহন |
| (৭৬) | 1123 | শ্রীকৃষ্ণ |
| (৭৭) | 1292 | দশাবতার |
| (৭৮) | 1439 | দশমহাবিদ্যা |
| (৭৯) | 1652 | নবগ্রহ |
| (৮০) | 1787 | মহাবীর হনুমান |
| (৮১) | 1495 | ছবিতে চৈতন্যলীলা |
| (৮২) | 1888 | জয় শিব শংকর |
| (৮৩) | 1889 | স্বনামধন্য ঋষি-মুনি |
| (৮৪) | 1891 | রামলালা |
| (৮৫) | 1892 | সীতাপতি রাম |
| (৮৬) | 1893 | রাজা রাম |
| (৮৭) | 1977 | ভগবান সূর্য |
| (৮৮) | 330 | ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য) |
| (৮৯) | 1496 | পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা |
| (৯০) | 1659 | শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম |
| (৯১) | 1881 | হনুমানচালীসা (মূলপাঠ, অর্থসহ) |
| (৯২) | 1880 | হনুমানচালীসা (মূলপাঠ) |
| (৯৩) | 1852 | রামরক্ষাস্তোত্র |
| (৯৪) | 1356 | সুন্দরকাণ্ড |
| (৯৫) | 1322 | শ্রীশ্রীচণ্ডী |
| (৯৬) | 1743 | শ্রীশিবচালীসা |
| (৯৭) | 1785 | ভাগবতের মণিমুক্তা |
| (৯৮) | 1786 | মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্‌ |
| (৯৯) | 1795 | মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ |
| (১০০) | 1784 | প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ |
| (১০১) | 1797 | স্তবমালা |
| (১০২) | 1835 | সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা |
| (১০৩) | 1834 | শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম |
| (১০৪) | 1839 | কৃত্তিবাসী রামায়ণ |
| (১০৫) | 1838 | জীবন যাপনের শৈলী |
| (১০৬) | 1853 | আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য |
| (১০৭) | 1854 | ভাগবত রত্নাবলী |
| (১০৮) | 1920 | আহার নিরামিষ না আমিষ ? সিদ্ধান্ত নিজেই নিন |
| (১০৯) | 1946 | রামায়ণ মহাভারতের কতিপয় আদর্শ চরিত্র |
| (১১০) | 1948 | এর নাম কি উন্নতি, না ধ্বংস ?—একটু ভেবে দেখুন |